Dawahilallah 1441 H. | 2020 | ISSUE-1

সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য

# দাওয়াহ ইলাল্লাহ

دعوة إلى الله

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

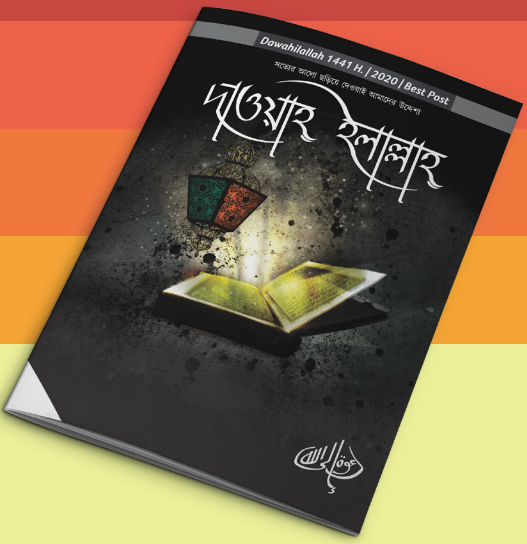
Dawahilallah 1441 H. | 2020 | Best Post
সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য
দাওয়াহ ইলাল্লাহ

# সূচী

০৩ সম্পাদকীয়: গনতন্ত্র বনাম ইসলাম
০৪ আল জিহাদ: উম্মতে মুসলিমার ব্লাড ক্যান্সার
০৬ আমরা নির্বাচনের 'জিহাদ' করি, কিন্তু গণতন্ত্র করি না!
০৮ জিহাদি কাজে সম্পৃক্ত ভাইদের প্রতি আহবান!
১০ আকাবিরদের সবক!
১২ কবিতা! শহিদী কাফেলায়
১৩ শরী'য়তের আহকাম: যেসব কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে
১৪ কি কি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে জিহাদের আমীর বানানো উচিৎ?
১৬ মানহাজ: শত্রুর চোখে - বাংলাদেশে আল-কায়েদার কৌশলের দুর্দান্ত সফলতা
১৮ ইসলামের ইতিহাস: দেখিস বেটা! গুলি যেন পিঠে না লাগে !!
১৯ ফেতনা: মুরজিয়া আকিদা একটি শিরকি আকিদা
২০ সংশয়: জিহাদ হাসান লি-গাইরিহি
২৪ হুসাইন ইবনু মানসুর হাল্লাজ'কে নিয়ে সাদামাটা কিছু কথা।
২৬ সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী

# গণতন্ত্র বনাম ইসলাম

সকল প্রশংসা সেই রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি আমাদেরকে ইসলামের মতো পরিপূর্ণ এক দ্বীন তথা জীবন বিধান দান করেছেন। লক্ষ-কোটি দুরুদ ও সালাম সেই নবীউস-সাইফ, নবীউল মালাহিম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর; যিনি আপন দেহ মুবারকের পবিত্র খুন ঝরিয়ে এই দ্বীনকে ধরণীতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

প্রিয় পাঠক!

আজ হতে দেড় হাজার বছর পূর্বে নবীউস-সাইফের হাতে গড়া এই কাফেলা। এই দ্বীনকে বিজয়ী করতে বদরের প্রান্তর থেকে পথচলা শুরু করেছিল, রক্ত পিচ্ছিল সেই কাফেলার সেই পথচলা আজও চলমান এবং কেয়ামত অবধি চলবে অবিরাম। নবীজির ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী কোন জালিমের জুলুম-নির্যাতন কিংবা ইনসাফ-গণের ইনসাফ বিপ্লবী এই কাফেলার অগ্রযাত্রা রুখতে পারবে না।

আর সেই নির্ভিক কাফেলার বর্তমান সময়ের এক অকুতোভয় সেনাপতি, পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন মাওলানা আসেম উমর দা. বা.।

গণ- অর্থ মানুষ আর তন্ত্র অর্থ- নীতি, গণতন্ত্র- মানুষের তৈরী নীতি। মানুষের গণপ্রসূত নীতির মাধ্যমে কোন দিন জাতির কল্যাণ আসতে পারে না। বরং জীবন পরিচালনার জন্য সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বিধান অপরিহার্য। সারা বিশ্বে আজ গণতন্ত্রের জয়-জয়কার তাই বলে কি আমরাও গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় ভেসে পড়ব, না-কি চিন্তা এবং বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং হলেও তা টিকে থাকবে না। তার বাস্তব প্রমাণ আলজেরিয়া, মিশর। আর যদি আমরা বলি বর্তমানে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত সম্ভব নয়, বরং সেটা ছিল আগের যুগের জন্য। কিন্তু একথা অহেতুক হওয়ার জন্য বর্তমান আফগান বিজয় এবং সে দেশ কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক পরিচালনাই যথেষ্ট।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে "জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস" কথাটি কুরআন বিরোধী হওয়ার সাথে সাথে যৌক্তিক কিছু অসারতাও রয়েছে। যেমন-

১। নীতিগতভাবে গণ ইচ্ছার প্রভুত্ব স্বীকৃতি হয়েছে বটে কিন্তু দলীয় ইচ্ছার ও পার্টির চেয়ারম্যানের নিরংকুশ কর্তৃত্ব চালানোর পদ্ধতি মাত্র।
২। গণ ইচ্ছার স্থায়ী কোন শক্তি নেই বরং দুর্বল এবং ক্ষণস্থায়ী।
৩। দলাদলী, দলত্যাগ, নতুন দলের উদ্ভব ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কাজেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বয়ং গণতান্ত্রের বাস্তবতাও নেই।

**- সম্পাদক**

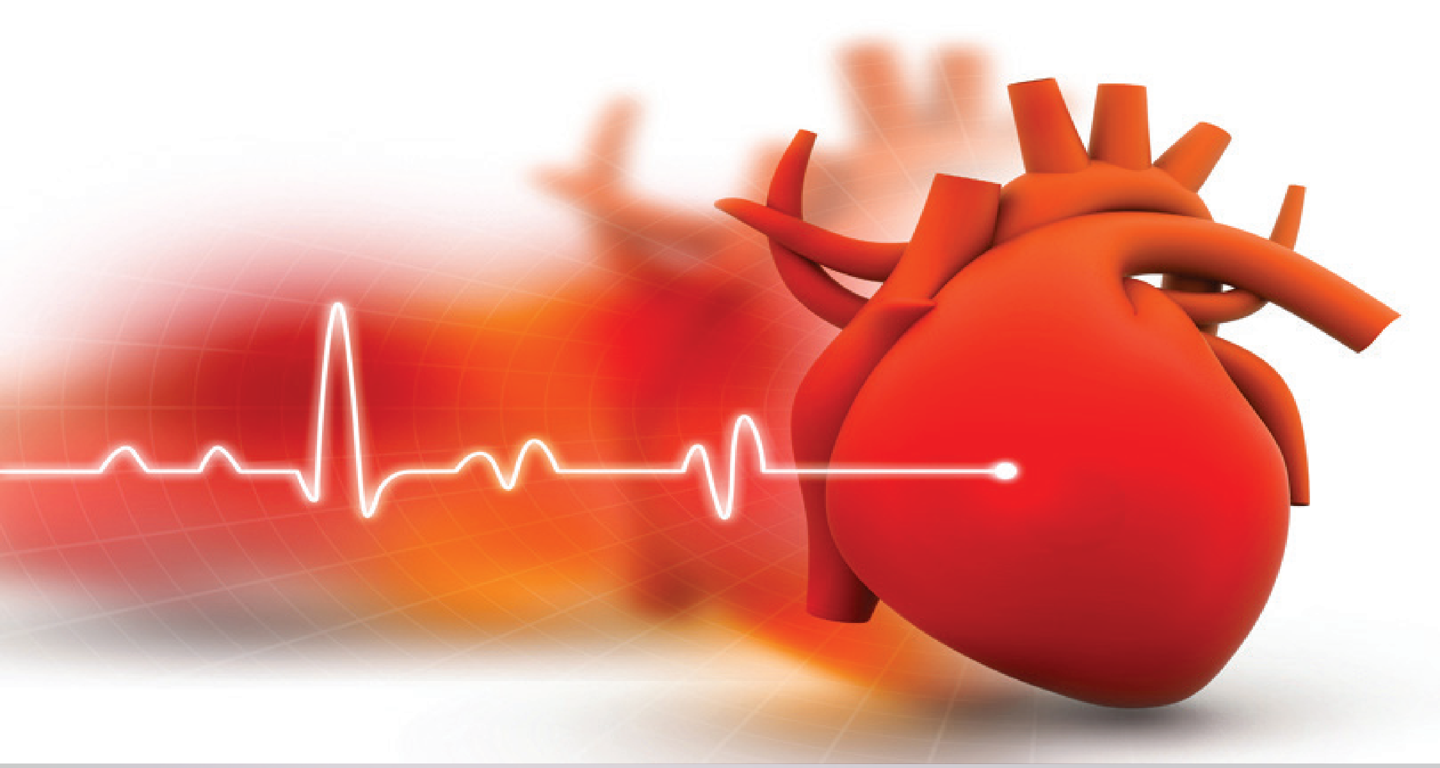

# উম্মতে মুসলিমার ব্লাড ক্যান্সার

উম্মে আয়েশা

“মানুষের যখন ব্লাড ক্যান্সার হয়, তখন আর সে বেঁচে থাকার আশা করেনা।”

আল্লাহ তাআলার খাস মেহেরবাণী না থাকলে তার মৃত্যু নিশ্চীত হয়ে যায়। তাকে মৃত্যুর জন্য সব-সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। যদি সে কিছুদিন বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে তার একমাত্র ঔষধ হলো, রক্ত পরিবর্তন করা। কারণ যতদিন পর্যন্ত শরীরে নষ্টখুন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সে রোগমুক্ত হয়ে বাচঁতে পারবেনা। কেননা রক্ত হলো শরীরের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের মধ্যে এক নম্বর! যেটা না হলে শরীর মরে যাবে, বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই।

এই ক্যান্সারমুক্ত হতে হলে সাভাবিকভাবে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয় টাকার। যার টাকা থাকে সেই নষ্টখুন পরিবর্তন করে শান্তিতে কিছুকাল বসবাস করতে পারে। কিন্তু যে অসহায়, যার টাকা নেই, সে কী করে? রক্ত পরিবর্তন করে শান্তিতে বসবাস করার আশা করতে পারে? না না! বিষয়টা সাধারণত একটু মুশকিল। এজন্য তার মৃত্যুর রাস্তাই বেঁচে নেওয়া উচিৎ!

এখন যে এই রোগ থেকে রেহাই পেতে চায়, তাকে বলা হবে- প্রথমে টাকা জমা করো তারপর আরামের ফিকির করো। টাকা নেই পয়সা নেই শুধু বলবে রোগমুক্ত হতে চাই! তাহলে বিষয়টি অনেক কঠিন হবে! আর আজকে আমাদের অবস্থাও এর বিপরীত কিছু নয়!

বর্তমানে যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে, আর সেই মুহূর্তে আমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। তখন আমাদের অবস্থাও ঐ ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তির মতই। আমরাও ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছি, কিন্তু তার ঔষধ পাচ্ছিনা! বলতে পারবেন কি আমাদের ক্যান্সারের ঔষধ কী? আচ্ছা শুনুন- এর মহৌষধ হচ্ছে একমাত্র “**জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ!**”

পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে, সর্বপ্রথম যেই জিনিস প্রয়োজন তা হলো -“**জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ**।”
কেননা জিহাদ হচ্ছে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখার মধ্যে সর্বপ্রথম। যার জিহাদ থাকবেনা সে লাঞ্ছিত, অপমানীত, অভিসপ্ত...!

যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، ويستبدل قوما غيركم،

ولا تضروه شيئا، والله علي كل شيئ قدير*

অর্থাৎ: আর যদি তোমরা (জিহাদে) বের না হও, তাহলে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদেরকে অন্য কওম দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আর তোমরা তার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। [সূরা তাওবাহ-৩৯]

এখন আমরা যারা কিতাল করার হিম্মত রাখি, সর্বাবস্থায় বুকে আল্লাহ ও তার রাসূলের মুহাব্বতকে গালেব রাখি, সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তত থাকি, জিহাদের স্পৃহা ও শহীদ-গাজী হবার স্বপ্ন দেখি, মুশরিক, মুরতাদ, হিন্দু-মালাউনদের চিরতরে জাহান্নামের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি তারাই একমাত্র এই নষ্টসমাজকে পরিবর্তন করে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে পৃথিবীতে সম্মানিত হয়ে বেঁচে থাকতে কিংবা শহীদ হয়ে উভয় জাহানে সৌভাগ্যশীল হওয়ার আশা করতে পারি।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলছেন:

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفنهم في الأرض

অর্থাৎ: আল্লাহ তাআলা ঐ মানুষদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমাল (জিহাদ) করেছে, তিনি যমীনে তাদের হাতেই খিলাফাত দান করবেন। [সূরা নূর-৫৫]

পক্ষান্তরে আমরা যদি গাইরুল্লাহর ভয়ে চুপটি করে ঘরে বসে থাকি, আমাদের দীলে যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের মুহাব্বত না থাকে, জিহাদকে অপছন্দ ও দুনিয়ার ভালোবাসা যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসা অপেক্ষা বেশী হয়ে থাকে, যদি আমরা ওয়াহানে আক্রান্ত থাকতে পছন্দ করি, যদি মুসলিম উম্মাহকে তার হারানো গৌরব ফিরিয়ে দিতে, নিজের প্রাণটা বিলিয়ে দিতে সর্বদা প্রস্তত না থাকি তবে আমরা কি এই পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে পারব? আমরা কি মুসলিম উম্মাহকে তার হারানো গৌরব ফিরিয়ে দিতে পারব?

আমাদের দ্বারা কি কক্ষনো শরীআহ প্রতিষ্ঠা হবে? আমরা কি লাঞ্ছনা-অপমান হতে মুক্তি পাব? বে-দ্বীনরা কি আমাদেরকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র ভয় পাবে? আমরা কি আল্লাহর যমীনে খিলাফাহ দেখতে পারব? শুধু খিলাফাত কায়েম করব বলে বসে থাকলেই কি তা প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে? না না! কক্ষনো না, অসম্ভব, হতেই পারেনা।

এজন্য আমাদের উচিৎ, আমরা যেন ঐ অসহায় ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তির মতই বেঁচে থাকার সামর্থ না রেখে ধুকে ধুকে- তিলে তিলে মরার রাস্তাই নির্নয় করে নিই।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد،

سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

“যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না।”
[সুনানে আবু দাউদ]

আজ বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন- সিরিয়া, ইয়েমেন, ইরাক, মায়ানমার, ভারত ও কাশ্মীরসহ আমরা সকল ভূমির মুসলিমরা এক মহাক্যান্সারে ভুগছি, কিন্তু আমরা আমাদের রোগের ঠিক ঔষধ পাচ্ছি না। কারণ কী? কারণ একটাই, আর তাহলো আমরা জিহাদ ছেড়ে ঘরে বসে আছি। আমরা তো বোকার মত মার ঠিকই খাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না যে, আসলে আমাদের ভুল কোথায় ও তা চিকিৎসার উপায় কী? এর চিকিৎসা আল্লাহ তাআলা কুরআনে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে লক্ষ করে বলছেন:

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله

অর্থাৎ: আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো যতক্ষন না ফিতনা নির্মূল হয়ে পুর্ণাঙ্গ দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।
[সূরা আনফাল-৩৯]

এখন আমাদের করণীয়:

যদি আমরা এই যুলুম-অত্যাচার আর লাঞ্ছনা-অপমান থেকে রেহাই পেতে চাই, তাহলে আমরা যেন আজ থেকেই “জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য ফিদায়ী হতে নিজেদের নাম লিখিয়ে নেই।”

এখন আমরা যারা সেখানে নাম লিখাবো, তারাই মুক্তি পাবো। আর যারাই এর থেকে বিরত থাকবো, তারাই ব্লাড ক্যান্সারে ভুগবো।

“ছাঁদ ছাড়া বিল্ডিং এর যেমন কোনো দাম নেই, জিহাদ ছাড়া ঈমানেরও তেমন কোনো দাম নেই!”

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজেদের সঠিক ভুল বুঝিয়ে দিন ও জিহাদের ময়দানে ঝাপ দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার তাওফীক দিন।
আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!

# আমরা নির্বাচনের 'জিহাদ' করি, কিন্তু গণতন্ত্র করি না!

কালো পতাকাবাহী

গণতন্ত্রকে বলা হয় জনগণের শাসন। কিন্তু কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কি প্রতিটা আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে দেশের আপামর জনসাধারণের অভিমত নেওয়া হয় এবং তাদের সবার অভিমতের ভিত্তিতে, বা পুরো দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশের রায়ের ভিত্তিতে বিধান প্রণীত হয়? উত্তর নিশ্চয়ই ‘না’ হওয়ার কথা। আচ্ছা, তাহলে গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন বলার কী অর্থ?

প্রতিটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ নিয়মানুযায়ী জনগণের ভোটের ভিত্তিতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়; যারা জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে-

-পুরো দেশ থেকে জনপ্রতিনিধি সংগ্রহ করা হয়। জনপ্রতিনিধিদের কাজ হয়ে থাকে জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা, জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করা। ইসলামে ‘হাকিম’ হিসেবে নির্দ্বিধায় নিঃশর্তভাবে আল্লাহকে মেনে নেওয়া হয়। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পার্লামেন্টকে সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ও আইনসভা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। ইসলাম আমাদেরকে কালিমা শেখায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আর গণতন্ত্র আমাদেরকে কালিমা শেখায় ‘লা ইলাহা ইল্লান্নাস’।

কেউ যদি বলে, ‘আমরা নির্বাচন করি; কিন্তু গণতন্ত্র করি না’ তাহলে সে গণতন্ত্রই চিনতে পারেনি। গণতন্ত্রের প্রাণই হলো নির্বাচন। কারণ, নির্বাচন ছাড়া জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবে না। আর জনপ্রতিনিধি ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। কেউ যদি বলে, ‘আমি মদ খাচ্ছি কিন্তু নেশা করছি না’—এ কথাটা যেমন হাস্যকর; উপরিউক্ত কথাটিও তা-ই। নির্বাচনের দ্বারা যদি দেশের হুজুরসমাজও নির্বাচিত হয় তাহলেও তারাই হবে ‘হাকিম’। তাদের অধিকার থাকবে আইন প্রণয়ন করা; যে অধিকার ছিল আল্লাহ তাআলার। অর্থাৎ তারা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শরিক হবে।

এবার ইসলামি ডেমোক্রেটিকরা যদি বলে, ‘আমরা তো পার্লামেন্টে বসে মনগড়া আইন প্রণয়ন করব না; বরং কুরআন-সুন্নাহর আইনই প্রণয়ন করব। সুতরাং আমাদের গণতন্ত্র তো বৈধ হওয়ার কথা।’ তাহলে তাদেরকে বলা হবে, প্রথমত এটা কাল্পনিকভাবে সম্ভব হলেও বাস্তবে এর কোনো সম্ভাব্যতা নেই। উপরন্তু তোমাদের পার্লামেন্ট থেকে সেসব আইনকানুন তো এ জন্য কার্যকর হবে না যে, সেগুলো আল্লাহ তাআলা বলেছেন বা তাঁর রাসুল নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বরং তা তো এ জন্য কার্যকর হবে যে, এগুলোর ওপর তোমাদের অধিকাংশজন একমত হয়েছে। সুতরাং ‘হাকিমিয়্যাত’ তো আল্লাহকে দেওয়া হচ্ছে না; বরং দেওয়া হচ্ছে তোমাদেরকেই। তাই এ ক্ষেত্রেও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বাস্তবায়িত হচ্ছে না; বরং বাস্তবায়িত হচ্ছে ডেমোক্রেসির কালিমা ‘লা ইলাহা ইল্লান্নাস’।

তারচে বড় কথা হলো, ইসলামি ডেমোক্রেটিকরা শাসনক্ষমতায় গিয়ে কি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে নাকি এতকাল থেকে চলে আসা কুফরি সংবিধানেরই রক্ষণাবেক্ষণ করবে? সংবিধানের ভাষ্য অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ কুফরি ধারা ও মূলনীতিগুলো (অর্থাৎ প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ)-এর বিধানাবলি সর্বদা অপরিবর্তিত ও সংশোধনের অযোগ্য।[১]

এই কুফরি সংবিধান সংরক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতি বা বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য প্রত্যেকের শপথ বাক্যে আছে যেমন:-
‘আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব।’[২]

তো ইসলামি ডেমোক্রেটিকরা ক্ষমতা গ্রহণের সূচনালগ্নেই যে শপথ বাক্য পাঠ করবে, তার পর তাদেরকে কি আদৌ মুসলমান গণ্য করার সুযোগ থাকবে? নাকি তারা সঙ্গে সঙ্গে মুরতাদ হয়ে যাবে?

সংসদ নির্বাচনে যারা ভোট দেয়, তারা তাদের সকলের সম্মিলিত অধিকার ‘হাকিমিয়্যাত’কে সন্তুষ্টচিত্তে তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে তুলে দেয়। এরপর তাদের প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টে বসে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করে। সুতরাং ভোটদাতারা যতটা সচ্চরিত্রবান লোককেই ভোট দেক না কেন, তারা আল্লাহ তাআলার অধিকারকে প্রথমে নিজেদের জন্য সাব্যস্ত করে এবং তারপর সেই অধিকারকে অন্য কিছু লোকের হাতে তুলে দেয়। নিঃসন্দেহে এটা স্পষ্ট শিরক। পৃথিবীর সব ধরনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়; কিন্তু সংসদ সদস্য নির্বাচনে এ কথাটি অবশ্যই প্রযোজ্য। কেউ যদি বলে, এটা সাক্ষ্য তাহলে তাকে বলা হবে, সাক্ষ্য তো বুঝলাম। কিন্তু কিসের সাক্ষ্য? ‘হাকিমিয়্যাত’ গাইরুল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করার সাক্ষ্য?

সংসদ সদস্য নির্বাচনের মতো একটি শিরকি কর্মকাণ্ডকে যারা জিহাদ বলে চালিয়ে দেয় এবং মুসলিম জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে, তাদের জিহাদ কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাকি ইসলাম ও কুফরের মিশ্রণ ঘটিয়ে দীনে এলাহি প্রতিষ্ঠার জন্য—তা আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেরা ‘হাকিম’ হওয়ার এই প্রতিযোগকে জিহাদ নাম দেওয়া সমীচীন, নাকি ক্রুসেডেরই পরিমার্জিত রূপ—তা সচেতন পাঠকই ভালো বলতে পারবেন। এই যুগে ইসলামের সবচে বড় শত্রু প্রকাশ্য কুফফার নয়; বরং লেবাসধারী ছুপা মুলহিদ ও জিন্দিকরাই ইসলামের সবচে বড় শত্রু। এদের দ্বারা ইসলামের যতটা ক্ষতি হচ্ছে, তা অন্য কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা হচ্ছে না। চোখ থেকে অন্ধত্বের চশমা খুললে অনেক বাস্তবতাই দিবালোকের মতো প্রোজ্জ্বল হয়ে দুচোখে ধরা দেবে।

সংগ্রহিত :- (আল্লাহ পাক লেখককে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে হেফাযত করুন। আমীন।)

বি: দ্র: নিয়ত করেছি যদি আল্লাহ পাক তাওফিক দেন, তাহলে উক্ত লেখকের লেখা সমূহ থেকে কিছু কিছু লেখা ফোরামে পোষ্ট করবো । আল্লাহ পাক-ই উত্তম তাওফিকদাতা।

---

[১] টিকা নাম্বার ১ :- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র। পৃ. ৩

[২] টিকা নাম্বার ২ :- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১। তৃতীয় তফসিল, ১৪৮ অনুচ্ছেদ, শপথ ও ঘোষণা, পৃ. ৬৫-৬৮

# জিহাদি কাজে সম্পৃক্ত ভাইদের প্রতি আহবান!

-umm khawla

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। সালাম ও সালাত বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবাদের উপর।

যেসব ভাইয়েরা মাঠপর্যায়ে জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত তাদের প্রতি ঘরে, বাইরে সবক্ষেত্রেই অসংখ্য অনুরোধ জমে আছে। সব নয়, তবে আজ তার কিছু বলবো।

প্রথমত, গ্লোবাল জিহাদের প্রস্তুতিপর্বে বর্তমানে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশ অনেকাংশেই পিছিয়ে আছে। সমর্থক ও লেখক বাড়লেও দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মীর বড়ই সংকট। কেননা তাওহিদের দাওয়াহ ও এর হাকিকত উপলব্ধি করা ব্যতীত জিহাদি চেতনা খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না।

তাই, মুজাহিদ দায়ি ও আলিমদের প্রতি আমার আবেদন, আপনারা ঘরে ঘরে তাওহিদের দাওয়াহ পৌছে দিন যেন মানুষের অন্তরে এটি বদ্ধমূল হয়ে যায়। উসুলি আলোচনায় কি লাভ যদি অন্তরে তাওহিদের চিত্র অংকিত না হয়।

দ্বিতীয়ত, বিচ্ছিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুমিনদের অন্তরের হতাশা দূর করতে ও তাদের উৎসাহিত করতে কিতাল ও জিহাদের ময়দানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। ময়দানে অবস্থানরত ভাইদের ফেইসবুক ও টুইটারে অনলাইনভিত্তিক দাওয়াহর মাধ্যমেই তা সম্ভব। আপনারা দাওলার দিকেই লক্ষ্য করুন, তারা কিভাবে যুবকদের মিডিয়ার মাধ্যমে উৎসাহিত করেছে। হ্যা, ত্রুটিপূর্ণ আকিদাহ ও ভুল পদক্ষেপের কারণে তারা প্রায় ধ্বংস হয়েছে কিন্তু মিডিয়ার কাজে তাদের রুচি, দক্ষতা ও কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। আমার জানামতে, টর ব্যবহার করে বর্তমানে নতুনভাবে ফেইসবুক পেইজ চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে ময়দানে অবস্থানরত ভাইরা দেশীয় তাগুতের হুমকি ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যার উর্ধ্বে। মিডিয়াতে তাদের ছোট ছোট উপদেশমালা মুমিনদের অন্তরকে নিঃসন্দেহে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করবে। পেইজের সুবিধা হলো, নিজেকে আড়ালে রাখা গেলে রিয়ার আশংকা থেকে মুক্ত থাকা যায়। ইনডিভিজুয়াল ফেইক আইডি ব্যবহারেও কিছু আশংকা থেকেই যায়।

তৃতীয়ত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো অলসতা পরিহার করে নিজেরা আন্তরিক হোন এবং ঘরের নারীদের তালিম ও তারবিয়াত শিক্ষা দিন। ফেইসবুক আর্টিকেল, ইউটিউব ও বই ধরিয়ে না দিয়ে বরং, আপনারা নিজেরাই তাদের নিয়ে বসুন। সুন্দর কথার দ্বারা, সবরের সাথে তাদের তাওহিদের শিক্ষায়

সুশিক্ষিত করুন। এতে করে আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভালোবাসা ও বন্ধন আরো সুদৃঢ় ও মজবুত হবে।

লক্ষণীয়, কেবল হাকিমিয়্যাহ-ই যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ তাওহিদ নয়। নারীদের একটি বিরাট অংশ আসমা ওয়াস সিফাতের বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে না, রুবুবিয়াত ও উলুহিয়াতের স্বরুপ জানে না। ই'তিদাল, ইরতিদাদ, ইস্তিহলাল, ইরজা ও গুলুহ এসব আলোচনা তাদের কাছে রীতিমতো দুর্বোধ্য ঠেকে। অনেকেই বলেন তাদের পর্দা ও স্বামীর আনুগত্য শিখলেই চলবে, যেন ইলমচর্চা ও বিভিন্ন শ্রেণীর ইলমি আলোচনাগুলো শুধুই পুরুষদের জন্য। নারীদের এসবে কি ফায়দা। আসলেই কি তাই? তাহলে ভেবে দেখুন, আপনার অবর্তমানে তারা আপনার সন্তানদের কি শেখাবে? কিভাবে তাদের অন্তরে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার ফিকির আসবে? কিভাবে তাদের কোলে নবির উত্তরসূরিরা বেড়ে উঠবে? নারীদের অজ্ঞতার ফলেই আজ দ্বীনি, বদদ্বীনি সবক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী প্রত্যেকেই উম্মাহর সম্পদ। একজন শিক্ষিত নারীই পারে একটি বিজয়ী ও ইমানদীপ্ত প্রজন্ম উপহার দিতে। এই ক্রান্তিকালে নারীদের পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ ছাড়া উম্মাহ কিছুতেই এগোতে পারবে না। 'কেবল' পর্দাসংক্রান্ত ইলম নয়, বাবা, মা, ভাই কিংবা স্বামীর প্রতি আনুগত্যের ইলম নয় বরং এসবকিছুর পেছনে তাওহিদের যে নিগুঢ় রহস্য ও তত্ত্ব লুক্কায়িত, সেব্যাপারেও তাদের ইলম ও গভীর উপলব্ধি থাকতে হবে। তাদের কাছে ইলম ও দাওয়াহ পৌছে দেবার দায়িত্ব আপনাদেরই। পাশাপাশি এই বাস্তবতা সম্পর্কেও তাদের বেখেয়াল করে রাখবেন না যে, এই তাওহিদের পথ সবর, অশ্রু ও রক্তে রচিত হয়।

এই পথে আছে হারানোর ব্যথা ও নিদারুণ কষ্টের হাহাকার। আবার এ পথের শেষেই আছে মুক্তি ও চিরবিশ্রাম। উম্মাহ আজ এমন সময়ে উপনীত হয়েছে যেখানে আমাদের রাজকন্যাদের আর পুতুল নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এখন তাদেরকে নিজ পরিবারের জন্য, উম্মাহর জন্য কঠোর পরিশ্রম ও মেহনত করতে হবে। তাই তাওহিদ প্রতিষ্ঠার এই কাফিলায় তাদের মেধা ও কর্মশক্তিকে বিফলে যেতে দেবেন না। তাদের অলস ও অকর্মণ্য করে রাখবেন না। মিডিয়া ও অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলোতে যত্নের সাথে আপনার নারীদের সম্পৃক্ত করুন। তাদের সাথে তাওহিদের আলোচনা করুন। তাওহিদ ও জিহাদের মজলিশগুলোতে পরোক্ষভাবে তাদেরকেও সাথী করে নিন। ফেমিনিজম, সেক্যুলারিজমের নীল বিষ থেকে বিরত রাখতে কিতাবুল্লাহর জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। তাওহিদই সবকিছুর মূলমন্ত্র। তাই তাদেরকে এর ইলম অর্জন ও বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করুন।

চতুর্থত, অহংকার ও নিজেকে নাসিহার উর্দ্ধে মনে করা থেকে বেঁচে থাকুন। রহমানের বান্দা তারাই যারা জমিনে বিনয়ী হয়ে চলাফেরা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে... খ্যাতি যেন আপনাদের মানদণ্ড না হয়। বিখ্যাতদের বিপরীতে অন্যরা যেন আপনাদের তাচ্ছিল্যের স্বীকার না হয়। সর্বদা মুহাসাবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকুন।

পঞ্চমত, বাবা মা ও আত্মীয়স্বজনের হকের প্রতি যত্নশীল হোন। ফিতনার আশংকা না থাকলে অন্তত কিছুক্ষেত্রে সামাজিক সম্পৃক্ততা বজায় রাখুন। এতে আপনার দাওয়াহর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে

আপাতত এতটুকুই। আল্লাহ আমাদের প্রতিটি সময়কে কাজে লাগানোর তাওফিক দিন। আমিন।

# আকাবিরদের সবক!

**কালো পতাকাবাহী**

ভারতবর্ষে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে লড়াই শুরু হয়েছিল, তখনকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা অতীব প্রয়োজন।

সে সময় শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. ‘দারুল হারব’-এর ফাতওয়া জারি করেছিলেন। এই ফাতওয়ার ওপর এই অঞ্চলের সবার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমার জানামতে এমন কোনো প্রমাণ নেই। হ্যাঁ, অনেকেই হয়তো মেনে নিয়েছিল। আবার অনেকে হয়তো ভিন্নমতও পোষণ করেছিল। থানবি রহ. তার যুগে ভারতবর্ষকে দারুল আমান ফাতওয়া দিয়েছিলেন এবং সেখানে লড়াইকে নিষিদ্ধ বলে ফাতওয়া জারি করেছিলেন। যদিও তখনো ভারত ছিল ব্রিটিশদের অধীনে, সেখানে ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠিত ছিল না, ছিল না রাষ্ট্রে মুসলমানদের বিজয় ও প্রাধান্য, ছিল না ইসলামের সব বিধান মান্য করা ও পালন করার অবাধ সুযোগ।

লড়াইয়ের সূচনাকালে থানাভবনকে দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য করে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয় সায়্যিদুত তায়িফাহ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি রহ.-কে, প্রধান সেনাপতি বানানো হয় কাসিমুল উলুম ওয়াল খায়রাত আল্লামা কাসিম নানুতবি রহ.-কে এবং প্রধান বিচারপতি বানানো হয় ফাকিহুন নাফস রশীদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.-কে।

এ থেকে বোঝা যায় :

(ক) সে যুদ্ধ ছিল প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং প্রাথমিকভাবে তার লক্ষ্য ছিল শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা।

(খ) প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য আমির প্রয়োজন। কারণ, যুদ্ধ একক কাজ নয়; দলবদ্ধ কাজ। আর দলবদ্ধ কাজে আমির না থাকলে শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। যদি দারুল ইসলামের আমির সরাসরি নিজে তত্ত্বাবধান করেন তাহলে তো সবচে ভালো। আর যদি যেকোনো কারণে তা সম্ভব না হয় তাহলে নিজেদের পক্ষ থেকে কাউকে আমির হিসেবে নির্ধারণ করে হলেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করা গেলে ভালো। একান্ত তা যদি না-ও হয়, তবুও বিক্ষিপ্তভাবে হলেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আর মুতাআখখিরিন ফকিহদের মতানুসারে বর্তমান বিশ্বকে একই আমিরের অধীনে আনা সম্ভব না হলে একাধিক আমির থাকতে পারে এবং প্রত্যেক আমিরের অধীনে আলাদা শরিয়াহভিত্তিক দাওলা হতে পারে।

(গ) সমগ্র জমিন আল্লাহর। কেউ এটাকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিভক্ত করতে চাইলেও তা বিভক্ত হয় না, আল্লাহর আওতা থেকে বেরিয়ে যায় না। জমিনের যেকোনো অংশের ওপর তামাক্কুন প্রতিষ্ঠা করে সে অংশে ইসলামি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করলেই

তা দারুল ইসলাম হয়ে যায়। এর জন্য বিশাল চৌহদ্দি ও অনেক বড় সীমানার অপরিহার্যতা নেই। অন্যথায় থানাভবন এলাকা আর কতটুকুই বা বড়! তৎকালীন মদিনাও বা কত বড় ছিল! যে যেখান থেকে লড়াই সূচনা করবে, তার জন্য উচিত প্রথমে সেই অঞ্চলে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা; যাতে করে দারুল ইসলামের একটা রোলমডেল সবার সামনে থাকে এবং আল্লাহর নুসরতও শামিলে হাল হয়।

(ঘ) প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়ে থাকে সাধ্য ও সামর্থ্য অনুসারে। আমাদের আকাবিররা যে সময় লড়াই করেছিলেন, সে সময় তাদের হাকিকি কুদরত কতটুকু ছিল? সংখ্যায় বা শক্তিতে তারা কি আদৌ ইংরেজ ও তাদের অনুগামীদের সমমানের বা কাছাকাছি ছিলেন? এতদ্*সত্ত্বেও লড়াই কীভাবে হলো? আর যারা এ অঞ্চলে লড়াই করেছিল, তারা সবাইও কি আদৌ এক আমিরের অধীনে বাইয়াতবদ্ধ হতে পেরেছিল? এমন কোনো অপরিহার্যতার ফাতওয়াও কি আকাবিরদের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছিল? তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রতিরোধ যুদ্ধ যখন ফরজে আইন হয়ে যায়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামর্থ্যে যা কিছু আছে, তা নিয়েই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হাকিকি কুদরত আর ওহমি কুদরতের প্রসঙ্গ এখানে আসবে না।

(ঙ) উসমানি সালতানাতের সরাসরি তত্ত্বাবধান ছাড়া আলাদা আমিরের অধীনে নিজেদের রূপরেখা অনুযায়ী লড়াই করে তারা ভারতবর্ষকে দারুল হারব থেকে বের করে পুনরায় দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন; যার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে থানাভবনকে দারুল ইসলাম বানিয়ে নিয়েছেন। লড়াই যে তারাই প্রথম শুরু করেছেন, বিষয়টা তা-ও নয়। তাদের পূর্বেও লড়াই হয়েছে। ইসমাইল শহিদ ও আহমদ শহিদরাও তাদের হাতে বাইয়াতবদ্ধ ছিলেন না। সেসব লড়াইয়েও আলাদা আমির ছিল। তারাও যে তুরস্কে গিয়ে ইজাযত এনেছেন এবং তাদের তত্ত্বাবধানে থেকে লড়াই করেছেন, এমন প্রমাণও নেই। পুরো ২০০ বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে বেরিয়ে আসবে এমন অনেক আমিরের সন্ধান, দিফায়ি লড়াইয়ে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রন্টে যারা ইমারাহ করেছেন। তাদের অনেকের ব্যাপারে উসমানি সুলতানদের হয়তো কোনো নলেজও ছিল না। এতদসত্ত্বেও এসবের ব্যাপারে কোনো অবৈধতার ফাতওয়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ছাড়া কেউ জারি করেছিল বলে আমার জানা নেই।

আকাবিরদের জীবনীর এসব দিক নিয়ে কি আমরা আদৌ ভাবি না? অন্যথায় আমাদেরকে যেসব উসুল শেখানো হয়, তার আলোকে তো এগুলোকে বৈধ ভাবার কথা নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভালোবাসার আরেক নাম দারুল উলুম দেওবন্দ। আমরা দারুল উলুম দেওবন্দকে ভালোবাসি। সর্বোপরি আমরা দারুল উলুম দেওবন্দের দিকে সম্পৃক্ত হওয়াকে গর্বের বিষয় মনে করি। দারুল উলুম একটি ধারা, একটি আদর্শ। তবে লক্ষণীয় যে, তা শরিয়াহর কোনো কষ্টিপাথর বা মাপকাঠি নয়।

দারুল উলুম দেওবন্দের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এমনকি কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে খোদ দারুল উলুমেই বিভক্তি হয়েছে। একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেওবন্দ দু-ভাগ হয়েছিল। এক পক্ষ সে বিষয়টাকে ওজর হিসেবে দেখেছিল, আরেক পক্ষ আদর্শের ওপর অবিচল ছিল। এক পক্ষ নানুতবি রহ.-এর সন্তানদেরকে দোষারোপ করছিল, আরেক পক্ষ মাদানি পরিবারকে অভিযুক্ত করছিল। ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের সময় যেমন এক পক্ষ থানবি রহ.-এর পক্ষাবলম্বন করেছিল, আরেক পক্ষ মাদানি রহ.-এর আদর্শের ওপর অবিচল ছিল।

দারুল উলুম ভারতের মতো একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠান টেকানোর স্বার্থে কখনোসখনো হিকমাহস্বরূপ কিছু কাজ করে থাকে; বাহ্যদৃষ্টিতে যেগুলো অসুন্দর ঠেকে। তাদের সে সকল কৌশলের ব্যাপারেও দেওবন্দি ঘরানার সব আলিম একমত, বিষয়টা তা-ও নয়। যেমন, প্রতিষ্ঠানের ভেতর বিজয় দিবস পালিত হওয়া, সেকুলারিজমের পক্ষে কথা বলা, তানজিমের বিপক্ষে বিবৃতি দেওয়া, তাবলিগের উভয় গ্রুপের সর্বপ্রকার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা। সচেতন যে-কেউ বুঝবে যে, এগুলো দেওবন্দি আদর্শ নয়; প্রতিষ্ঠান বাঁচানোর কৌশলমাত্র। দারুল আমানে বসে চুক্তিবদ্ধ কুফফারকে ধোঁকা দেওয়ার পদ্ধতিমাত্র।

তবে মজার বিষয় হলো, এগুলোকে অনেকে দলিল বানায়। দেশীয় ইসলামিক ডেমোক্রেটিকরা দলিল বানায় বিজয় দিবস পালনকে, মন্দের ভালো গ্রহণের নীতির প্রবক্তারা দলিল বানায় সেকুলারিজমের পক্ষে কথা বলাকে, ইরজাঘেঁষা বুদ্ধির ঢেঁকিরা দলিল বানায় তানজিমের বিপক্ষে বিবৃতি প্রদানকে আর এতাআতিরা দলিল বানায় তাবলিগের বিষয়টাকে। তাদের সামনে যদি বলা হয়, এ ক্ষেত্রে দেওবন্দ মাজুর। আর দেওবন্দ কোনো কষ্টিপাথর নয়। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তুমি তোমার আদর্শের অসারতা দেখো। অমনি শুরু হয়ে যায়, 'দেওবন্দবিরোধী', 'ইহুদি-খ্রিষ্টানের দালাল' ব্লা ব্লা ট্যাগ।

এই জাতি আবেগ দিয়ে ভাবে। বিবেক কাজে লাগায় না। যার কারণে ভালো ভালো লেবাসধারী বুদ্ধিজীবী বা চিন্তার ঢেঁকিরাও মাঝে মাঝে আবেগতাড়িত হয়ে বিবৃতি ঝাড়তে থাকে। তারা রাসুলের বদর-উহুদে নিজেদের জন্য কোনো দলিল না পেলেও ঠিকই দারুল উলুমের তানজিম-বিরোধিতার মধ্যে পেয়ে যায় অন্তর প্রশান্ত করা দলিল। ডেমোক্রেসি বা সেকুলারিজমের পক্ষের কথাবার্তায় তাদের চিত্ত হয় মোহমুগ্ধ। আনন্দের ভেলায় তারা ভাসতে থাকে। ময়ূরের মতো পেখম মেলে নাচতে থাকে।

সংগ্রহিত:- (আল্লাহ পাক লেখককে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে হেফাযত করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।)

বিবেক দিয়ে কোরআনকে নয়,
কুরআন দিয়ে বিবেক চালাতে চাই।

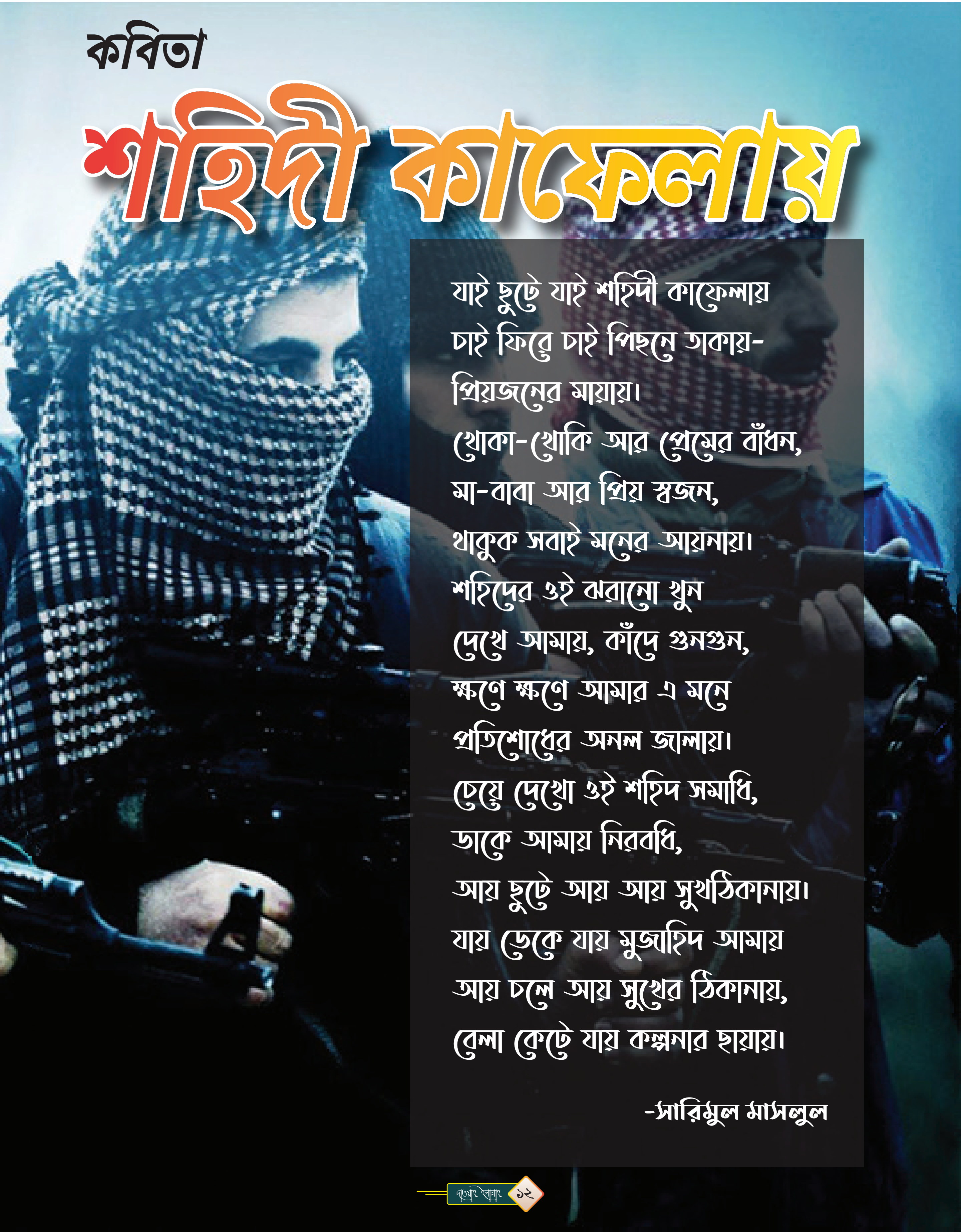

## কবিতা

# শহিদী কাফেলায়

যাই ছুটে যাই শহিদী কাফেলায়
চাই ফিরে চাই পিছনে তাকায়-
প্রিয়জনের মায়ায়।
খোকা-খোকি আর প্রেমের বাঁধন,
মা-বাবা আর প্রিয় স্বজন,
থাকুক সবাই মনের আয়নায়।
শহিদের ওই ঝরানো খুন
দেখে আমায়, কাঁদে গুনগুন,
ক্ষণে ক্ষণে আমার এ মনে
প্রতিশোধের অনল জ্বালায়।
চেয়ে দেখো ওই শহিদ সমাধি,
ডাকে আমায় নিরবধি,
আয় ছুটে আয় আয় সুখঠিকানায়।
যায় ডেকে যায় মুজাহিদ আমায়
আয় চলে আয় সুখের ঠিকানায়,
বেলা কেটে যায় কল্পনার ছায়ায়।

-সারিমুল মাসলুল

# যে কারণে একজন মুসলিম হত্যার উপযুক্ত হয়ে পড়ে

**ইলম ও জিহাদ**

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল অনেক দিন হল। মাঝখানে বেশ অনেক দিন বন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলার তাওফিক হলে আলোচনাটা পূর্ণ করার চেষ্টা করবো। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

আলোচনা চলছিল সিয়াসত ও তা'যিররূপে কাদের হত্যা করা হবে। বেশ অনেকেই এর আওতায় পড়ে। যেমন:-

১. যাদুকর।
২. বিদআতিদের গুরু।
৩. যিন্দিক।
৪. সমকামী।
৫. পশুর সাথে সঙ্গমকারী।
৬. যে ব্যক্তি তার মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গম করে।
৭. চোর।
৮. রাহজান ও ডাকাত।
৯. শ্বাসরূদ্ধ করে হত্যাকারী।
১০. ভারী বস্তু (যেমন পাথর ইত্যাদি) দিয়ে হত্যাকারী।
১১. মদখোর।
১২. যে ব্যক্তি শাসকদের কাছে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ করে লোকজনকে হত্যা করায়।

প্রথম পাঁচ জনের আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে। আজ ষষ্ঠ জনকে নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

## ৬. আপন মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গমকারী।

হাদিসে মাহরাম মহিলার সাথে সঙ্গমকারীকে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে। যেমন এক হাদিসে এসেছে,

(ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه)

"যে ব্যক্তি তার মাহরামের সাথে সঙ্গম করে, তাকে হত্যা করে দাও।" -তিরিমিযি : ১৪৬২

যিনার শাস্তি হল অবিবাহিত হলে বেত্রাঘাত আর বিবাহিত হলে রজম করে হত্যা। কিন্তু এ ব্যক্তির বেলায় বিবাহিত অবিবাহিতের কোন পার্থক্য না করে হত্যা করে দিতে বলা হয়েছে। বুঝা গেল, এর শাস্তি যিনার শাস্তি নয়। তাহলে হত্যা কি হিসেবে? ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

قالوا: جاز فيه أحد الأمرين أنه للاستحلال،
أو أمر بذلك سياسة وتعزيرا. اهـ

"উলামাগণ বলেন, এখানে দু'টির কোন একটি হতে পারে: হয়তো হালাল মনে করার কারণে, নয়তো সিয়াসত ও তা'যিররূপে এ আদেশ দিয়েছেন।" –ফাতহুল কাদির ৫/২৬১

অর্থাৎ যদি হালাল মনে করে করে থাকে তাহলে তো মুরতাদ। মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে। আর যদি হালাল মনে না করে থাকে, হারাম জেনেও করে থাকে তাহলে হত্যা করতে বলা হয়েছে সিয়াসতরূপে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবাদিতে দেখা যেতে পারে।

ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

# কি কি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে জিহাদের আমীর বানানো উচিৎ?

-ahkamus Siysr

উত্তর: প্রত্যেকটি পদ একেকটি আমানত। উপযুক্ত ব্যক্তির হাতেই তা সমর্পণ করতে হবে। যে পদের জন্য যে উপযুক্ত তাকেই নিয়োগ দিতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। স্বজনপ্রীতি করে অনুপযুক্ত কাউকে নিয়োগ দেয়া যাবে না। এটি শরীয়তের সার্বজনীন মূলনীতি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা অবশ্যই আমানতসমূহ উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবে।”- নিসা ৫৮

হাদিসে এসেছে, (إنها أمانة)

“নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও পদসমূহ হচ্ছে আমানত।” –সহীহ মুসলিম ৪৮২৩

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমানত যখন নষ্ট করা হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করতে থাকবে। সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমানত কিভাবে নষ্ট করা হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব যখন অযোগ্য লোকের হাতে সমর্পণ করা হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করতে থাকবে।”

–সহীহ বুখারি ৬১৩১

ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮হি.) বলেন,

وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب ... وقد أجمع المسلمون على معنى هذا. اهـ

“(কুরআনে কারীমের পাশাপাশি) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত থেকেও প্রমাণিত যে, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও পদসমূহ আমানত। ... এ ধরনের বিষয়াশয়ে সকল মুসলমানের ইজমা বিদ্যমান।” –মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/২৪৮

অতএব, প্রতিটি পদ এমন ব্যক্তির হাতেই সমর্পণ করতে হবে যে তার উপযুক্ত। জিহাদের বেলায়ও এমনই। এমন ব্যক্তিকেই আমীর নির্ধারণ করবে যে এর উপযুক্ত এবং যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সফল হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯হি.) বলেন,

وينبغي أن يستعمل على ذلك البصير بأمر الحرب، الحسن التدبير لذلك، ليس ممن يقحم بهم في المهالك، ولا ممن يمنعهم عن الفرصة إذا رأوها، لأن الإمام ناظر لهم، وتمام النظر أن يؤمر عليهم من جربه بهذه الخصال، فإنه إذا كان يمنعهم من الفرصة يفوتهم ما لا يقدرون على إدراكه، على ما قيل : الفرصة خلسة. وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بدا من متابعته، ثم يخرج هو بقوته وربما لا يقدرون على مثل ما قدر هو فيهلكون. اهـ

“এমন ব্যক্তিকে আমীর বানাতে হবে যে রণকৌশলে অভিজ্ঞ। যুদ্ধ পরিচালনায় সুদক্ষ। এমন (দুঃসাহসী) নয় যে, মুজাহিদদেরকে বিপদের মুখোমুখী করে বসবে, আবার এমন (অদক্ষ)ও নয় যে, উপযুক্ত কোনো সুযোগ পেয়ে গেলেও তাদেরকে (হামলা করা থেকে) বারণ করে রাখবে। ইমামুল মুসলিমিন উম্মাহর কল্যাণার্থে নিযুক্ত। আর পরিপূর্ণ কল্যাণ এরই মধ্যে যে, এমন ব্যক্তিকে আমীর বানাবে যার মাঝে এসব গুণ পরীক্ষিত। কেননা, সুযোগের সময় যদি আমীর মুজাহিদদের বারণ করে রাখে তাহলে এমন একটি সুযোগ তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল যার ক্ষতিপূরণ আর সম্ভব নয়। বলা হয়, ‘সুযোগ মূহুর্তেই কাজে লাগাতে হয়, নয়তো হাতছাড়া হয়ে যায়’। অপর দিকে দুঃসাহসিকতার কারণে আমীর যখন বাঘের মুখে ঝাঁপ দেবেন অনুসারি মুজাহিদদের জন্য তার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এরপর তিনি হয়তো শক্তিশালী হওয়ায় বেঁচে আসতে পারবেন কিন্তু অন্যরা হয়তো তা পারবে না। ফলে ধ্বংসের শিকার হবে।”

–শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/৭৫

ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

وإنما يؤمر عليهم من يكون صالحا لذلك، بأن يكون حسن التدبير في أمر الحرب ورعا مشفقا عليهم سخيا شجاعا. اهـ

“কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিকেই আমীর বানাবে। উপযুক্ত হচ্ছেন, যে যুদ্ধ পরিচালনায় সুদক্ষ। আল্লাহভীরু। মুজাহিদদের প্রতি দরদি। প্রশস্ত দিলের অধিকারী। বীর বাহাদুর।”

-মাবসূতে সারাখসী ১০/৪

আরো বলেন,

ويحكى عن نصر بن سيار مقرب البرامكة الذي أخرجه أبو مسلم عن مرو أنه قال : اجتمع عظماء العجم على أن من كان صاحب جيش فينبغي أن يكون فيه عشر خصال من خصال البهائم : شجاعة كشجاعة الديك ، وتحنن كتحنن الدجاجة يعني الشفقة ، وقلب كقلب الأسد ، وغارة كغارة الذئب ، وحملة كحملة الخنزير ، وصبر كصبر الكلب أي على الجراحة وحرص كحرص الكركي ، وروغان كروغان الثعلب أي الحيل وحذر كحذر الغراب ، وسمن كسمن الدابة التي لا ترى مهزولة أبدا ، وهي تكون بخراسان. اهـ

“নাসর ইবনে সাইয়ার রহ. থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, অনারবের সকল যুদ্ধবিশারদ একমত যে, সেনাপতির মাঝে জানুয়ারের দশটি ভাল গুণ থাকতে হবে: ১. মোরগের মত বাহাদুরি; ২. মুরগির মতো স্নেহ ও দরদ; ৩. সিংহের মতো সাহসী অন্তর; ৪. বাঘের মতো আকস্মিক ক্ষিপ্র আক্রমণ; ৫. শুকরের মতো হামলা; ৬. কুকুরের মতো জখমে ও আঘাতে ধৈর্য ধারণের সক্ষমতা; ৭. সারসের মতো লোভ; ৮. শিয়ালের মতো চতুরতা ও কৌশল; ৯. কাকের মতো সতর্ক দৃষ্টি; ১০. খোরাসানের একটি জন্তুর মতো বলিষ্ট দেহ যে জন্তুটি কখনোও শীর্ণ হয় না।”

-শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/৭৬

# শত্রুর চোখে-বাংলাদেশে আল-কায়েদার কৌশলের দুর্দান্ত সফলতা

-ibrahim husain

জোসেফ অলচিন কর্তৃক লিখিত। জোসেফ অলচিন একজন লেখক ও সাংবাদিক। বাংলাদেশে ইসলাম্পন্থীদের কর্মকান্ড নিয়ে সে বিভিন্ন লেখালেখি করেছে। অন্যান্য কাফির ও পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের মতো তার লেখায় সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ আছে। আছে সঠিক তথ্য, এবং ভুল তথ্য। তবে অন্যান্যদের তুলনায় তার লেখায় ভুল তথ্যের হার কম।

নিচের লেখাটির সাথে কিছু কিছু বিষয়ে আমাদের দ্বিমত আছে। তবে মোটাদাগে আমরা মনে করি, এটি ভাইদের জন্য উপকারী হবে। আমরা এটাকে নিশ্চিত সঠিক বিশ্লেষণ হিসাবে দরকার নেই। বরং আমরা এটাকে “শত্রুর চোখে আমাদের কর্মকান্ডের বিশ্লেষণ” হিসাবে দেখতে পারি। আশা করি ভাইরা উপকৃত হবেন।

## বাংলাদেশে isis ও আল-কায়েদার কর্মপদ্ধতির পর্যালোচনা

বাংলাদেশে is এর অনুসারীরা সাধারণত খবরের শিরোনাম কেড়ে নেওয়ার মত হামলাতে আগ্রহী। এদের অনেকেই ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিরিয়া, জাপান থেকে এদেশে এসেছে অথবা বিভিন্ন সময়ে এসকল দেশে ভ্রমনের জন্য গিয়েছিল। একারণে এদের দেশীয় পর্যায়ে যোগাযোগের তুলনায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যোগাযোগ বেশি।

isis ও তাদের অনুসারীরা টার্গেট নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত নিয়মের অনুসরণ করে না। তারা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের কারণে কাউকে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না করে, হামলার লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে ‘এলোমেলোভাবে’। তারা আক্রমণের ক্ষেত্রে সামরিক ‘নিয়ম-নীতি’র চাইতে ‘ভাগ্য’কে বেশি প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তাদের আক্রমণ গুলো এমন হয় যে তারা সামরিক নিয়মগুলো মানে কিন্তু এটার উপর পুরোপুরি নির্ভর করে না। তারা সামরিক নিয়ম নীতির চাইতে তাদের ‘ভাগ্য’কে প্রাধান্য দেয় বেশি। তাদের চিন্তাধারা এমন যে, ভাগ্য ভালো হলে আক্রমণ সফল হবে।

বাংলাদেশ ২০১৬ তে হলি আর্টিসানের ঘটনা ঘটে। হামলা চলাকালীন সময়ে ও পরে পুরো বিশ্ব মিডিয়ার নজর বাংলাদেশের উপর ছিল। মিডিয়ার কাভারেজের দিক চিন্তা করলে এই হামলা অবশ্যই সফল। কারণ এই এক ঘটনা সারা বিশের মনোযোগ বাংলাদেরশের দিকে টেনে এনেছিল। isis সে সময় গোপনীয়তার সাথে কাজ করতে। isis এর প্রথম দিককার যে সকল ঘটনা বিশ্ব মিডিয়াতে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছিলে সেগুলোর মধ্যে হলি আর্টিসানের ঘটনা অন্যতম। হামলা চলাকালীন সময়ে হামলাকারীরা ভিতরকার অনেক ছবি প্রকাশ করেছিল। এটা মানুষের মধ্যে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ভয় ও ঘৃণা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সামাল দেওয়ার জন্য জিহাদিদের বিরুদ্ধে বিশাল ‘ক্র্যাকডাউন’ চালায়।

অন্যদিকে আল কায়েদার কর্মপদ্ধতি একেবারে ভিন্ন ছিল। অনেকেই মনে করেন যে, ২০১৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ কেন্দ্র করে আল-কায়েদা তাদের যে শাখা (aqis) এখানে খুলেছিল সেটা আসলে উপমহাদেশে isis কে প্রতিহত করার জন্য করা হয়েছিল। বাংলাদেশে isis এর তুলনায় আল-কায়েদা দুর্দান্ত সফলতা পেয়েছে। আল-কায়েদা হয়তো isis এর মত বিশ্ব মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার মত হামলা চালায়নি, তবে তারা যেভাবে কাজ করেছে সেটার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী।

এই দুই দলের প্রভাব বিস্তারকে ‘কচ্ছপ ও খরগোসে’র ঘটনার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। isis খরগোসের ন্যায় দ্রুত গতিতে মানুষের নজরে এসেছিল কিন্তু প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী করত পারে নি। অন্যদিকে আল কায়েদা ধীরে ধীরে তাদের সুচিন্তিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের নজরে এসেছে। আর তাই তাদের প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

এখন অবস্থা দেখে যেটা মনে হচ্ছে বাংলাদেশে আল-কায়েদা isis কে সফলভাবে প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছে। এই ভূমিতে আল-কায়েদার প্রভাব বিস্তারের অন্যতম একটা কৌশল হল তারা জনমানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং সে বিষয়ে তাদের অবস্থান সম্পর্কে মানুষকে জানায়। তারা তাদের অবস্থানের সাথে যায় এমন আন্দোলন ও অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীতে নিজেদেরকে জনমানুষ থেকে সরিয়ে রাখে না। বরং তারা যুব সম্প্রদায়ের ন্যায় সংগত অবস্থানে তাদের সমর্থন জানানোর মাধ্যমে যুবকদের আকৃষ্ট করতে আগ্রহী।

Aqis মূলত আঞ্চলিক কাজের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারা তাদের কাজের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তে উপামহাদেশের ঘটনাবলী নিয়ে কাজে মনোযোগ বেশি দেয়। পাকিস্তানভিত্তিক সংগঠন হওয়ার কারনে এটি উপমদেশকেন্দ্রিক কাজকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

Aqis তার হামলার লক্ষ্যবস্তু খুব চিন্তা- ভাবনা করে নির্ধারণ করে। এই ক্ষেত্রে সংঘঠনের উপরের দিককার নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তারা বিতর্কিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করে থাকেন।

তারা এমন ধরণের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্বের সাথে নির্ধারণ করেন যেগুলো প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের জন্য কাজ করে থাকে। যার ফলে মানুষ এমনিতেই এদের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব ধারণ করে। অন্যদিকে বর্তমান রাষ্ট্রগুলো ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে এসকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে দিতে বাধ্য থাকে। ফলে এমন একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যবস্তুতে রূপান্তর করার মাধ্যমে aqis একদিকে মানুষের সহানুভুতি পায় অন্যদিকে সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতে ফেলতে পারে।

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামির সাথে যারা আছেন তাদের অনেকেই '৭১ এর যুদ্ধাপরাধী'। এমন একটা অভিযোগ সেখানকার নাস্তিক ও সেকুলার ব্লগাররা দীর্ঘদিন যাবত করে আসছিল। এই সকল রাজনৈতিক নেতাদেরকে ব্লগাররা এমন একটি বিষয় নিয়ে অভিযুক্ত করে আসছিল যে বিষয়ের একটা ফিলসফিকাল ও ইমোশনাল প্রভাব সে দেশের মানুষের উপর রয়েছে।

২০১৫ সালের দিকে বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে ফুঁসে উঠে। ডানপন্থীদের পত্রিকা বলে পরিচিত 'আমার দেশ' সে সময় ব্যপক প্রোপাগান্ডা চালায়। এই পত্রিকাটির 'বিএনপি' নামক রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

এ সময় নাস্তিক ও সেকুলার ব্লগারদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মাদরাসা কেন্দ্রিক আলেম উলামাদের সমন্বয়ে 'হেফাজতে ইসলাম' নামক আন্দোলন শুরু হয়। সারাদেশের মাদ্রাসা ও মাদরাসা ছাত্রদের এই আন্দোলনে নিরুঙ্কুশ সমর্থন ছিল। aqis এই আন্দোলনের বিষয়বস্তু ও দাবীর সাথে পুরোপুরি একমত না হলেও হেফাজতের কাজকে সমর্থন করেছিল। অন্যদিকে দেশটির প্রধান দুই রাজনৈতিক দল চেষ্টা করছিল হেফাজতকে নিজেদের কাজে লাগানোর।

২০১৬ তে aqis সমকামীতার সাথে সংশ্লিষ্ট একজনকে হত্যা করে। aqis এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে সকল অভিযোগ এনেছিল সেটা হচ্ছে -সে lgbtq আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই বিষয়টি বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্য আরেকটি অভিযোগ যেটা আনা হয়েছিল সেটা হচ্ছে তাকে 'বিদেশী এজেন্ট' বলে দাবি করা হয়।

এই ঘটনা সরকারকে একটা বিরূপ পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। একদিকে বহির্বিশ্বের চাপ অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ জনগণের চাওয়া নিয়ে সরকার উভয় সংকটে পড়ে। এই ঘটনার থেকে বুঝা যায় যে aqis তাদের কার্যক্রম সাধারণ বিষয়াবলী যেমন "দৈনন্দিন জীবনযাত্রা" বা "পথভ্রষ্ট মুসলিমদের পরিচয় উন্মোচন"-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখে না। অর্থাৎ তারা প্রচলিত ধর্মপালনের পদ্ধতির মধ্যেই নিজেদেরকে 'সীমাবদ্ধ' করে রাখে না।

২০১৮ সালে aqis বাংলাদেশের দুইটি অভ্যন্তরীণ ঘটনাতে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে বিবৃতি প্রকাশ করে। একটা হচ্ছে 'নিরাপদ সড়ক আন্দোলন'। এটা শুরু হয়েছিল স্কুলের ২ জন শিক্ষার্থীর বাস চাপায় মারা যাওয়ার কারণে। সাধারণ স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলন শুরু করেছিল।

আরেকটি ঘটনা হচ্ছে মিয়ানমার থেকে সামরিক হামলার স্বীকার রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অবস্থান গ্রহণ। এই ঘটনার সময়ও aqis বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে এই ইস্যুতে তাদের অবস্থান তুলে ধরেছিল।

আমেরিকার সাথে সংশ্লিষ্ট একজন lgbtq কর্মকর্তা থেকে মায়ানমারের মুসলিমদের জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ- এই সকল ঘটনা থেকে aqis এর কাজের একটা প্যাটার্ন পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের সম্ভাবনা কেমন এটা শুধুমাত্র তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতে নির্ণয় করতে গেলে ভুল করা হবে। এখানকার ঘটনাবলীকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ ঘটনা হিসেবে দেখলেও ভুল করা হবে। বর্তমান বাংলাদেশ নানান কারণে জিহাদিদের একটি পছন্দের জায়গা। অন্যদিকে বয়সের হিসেবে এটা একটি শিশু রাষ্ট্র। মাত্র ৪৮ বছর বয়স এটার। সে হিসেবে এর আইন কানুনও এমন সমৃদ্ধ না যা সকল পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারবে। যার কারণে এখানে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতি ও বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

# দেখিস বেটা! গুলি যেন পিঠে না লাগে !!

হঠাৎ মোবাইল আনমনা মায়ের ভাবনা কে ছেঁদ করল, মা দুরু দুরু বুকে এগুচ্ছে আর ভাবছে... কে হতে পারে! আমার ছেলে ছেলে নয় তো !!

ধরতেই মায়ের ভাবনা সত্য হল, অপার থেকে ছেলে বলছে : মা আমরা শত্রুর বেড়াজালে আঁটকে গেছি হয়ত আর দেখা.........

মা ছেলে কে থামিয়ে দিয়ে বলল: বাবা মনে রাখিস মৃত্যু কেবল একবারই আসে, কবর শুধু একবারই রচিত হয়., পিছু হটবি না , দেখিস গুলি যেন তোর পিঠে না লাগে, মুসলিম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে তোর জীবন বিলিয়ে দে বাবা... ছেলে বলল মা ! আমি তো কেবল মাফ চেতে ফোন দিয়েছিলাম.... আর এটা বলতে ফোন দিয়েছি যে তোমার শহিদ ছেলের কবরে চোখের পানি ফেল না। মা বলল : বাবা অশ্রু আসবে কিন্তু তা সুখের অশ্রু ।..........

কাশ্মীরের কোলগ্রাম জেলার কাযীকুণ্ড এলাকার কম বয়সী এক বালক, তার কিছু সাথীদের সাথে মালাউনদের বিরুদ্ধে অস্ত্রতুলে নেয়, জিহাদ জিহাদ করতে করতে এক পর্যায়ে আটক হয়। এবং ক্রস ফায়ারে শহীদ হন.হায়!! যদি এভাবে.. মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মা ছেলের ইমানী চেতনা,শহীদি প্রেরণা পূর্ণ কথপোকথোন সব মায়েরা বলত সব ছেলেরা শুনতো......

# মুরজিয়া আকিদা একটি শিরকি আকিদা।

আল্লাহর ইচ্ছায় বিগত কয়েক বছরে বর্তমান যুগের খারেজীদের ব্যাপারে উম্মাহ একটা সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করেছে। কিন্তু অনেকেই আরেক আপদ 'মুরজিয়া গোষ্ঠীর' ফিতনার কথা ভুলে গেছেন।

মুরজিয়া গোষ্ঠী খারেজীদের বিপরীত। খারেজীরা কবিরা গুনাহের কারণে মুসলিমকে কাফির মনে করে আর মুরজিয়া গোষ্ঠী সুস্পষ্ট শিরকে আকবার ও কুফরে আকবার (নাওয়াক্বিদ) করলেও ঈমান অক্ষুন্ন থাকে বলে মনে করে। তারা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়গুলোকে (নাওয়াক্বিদুল ঈমান) জুহুদ এর শর্ত দিয়ে আটকে দেয়।

.

কিন্তু আহলে সুন্নাহ এই দুই বিভ্রান্ত দলের মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহন করে। তারা খারেজীদের বিপরীতে কবিরা গুনাহের কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় বলে মনে করেন না। আবার মুরজিয়াদের বিপরীতে নাওয়াক্বিদের কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় বলে মনে করেন।

.

ইতিহাসে যখন খারেজীদের আবির্ভাব হয়, একই সময় মুরজিয়াদেরও আবির্ভাব হয়। বর্তমান যুগের মুরজিয়ারা যদিও মুখে মুখে এই দাবী করে যেঃ "ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও আ'মলের সমন্বয়" কিন্তু বাস্তবে তারা নানা অযুহাতে আ'মলকে ঈমান এর বাইরে রেখে দেয়।

.

যেমনঃ মুসলিম নামধারী শাসকরা একাধিক 'নাওয়াকিদুল ঈমান' করলেও তাদের দৃষ্টিতে তারা ঈমানদার, কারণ হিসেবে তারা দাবী করেঃ 'হয়তো অন্তরে তারা এই কাজকে খারাপ জানে', অথবা 'আমরা তো তাদের অন্তরের খবর জানি না' ইত্যাদি।

.

অর্থাৎ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের দাবী হচ্ছে, অন্তরে কুফরী না করলে সেটা ঈমান বিনষ্টকারী হবে না। শুধু বাহ্যিক আ'মলের মাধ্যমে ঈমান বিনষ্ট হতে পারে না!! এছাড়া তারা এটাও দাবী করে যে, অন্তরে যতক্ষণ ঈমান আছে, ততক্ষণ বাইরের আ'মল যেমনঃ ইস্তেহলাল (আল্লাহর দেয়া বিধানকে পরিবর্তন বা হালালকে হারাম করা কিংবা হারামকে হালাল করা) এর কারণে ঈমান নষ্ট হয় না।

.

জঘন্য মুরজিয়া গোষ্ঠী সম্পর্কে সালাফদের কিছু বক্তব্যঃ

.

ক) ইমাম ইব্রাহীম নাখয়ী (রঃ) বলেছেন,

لأنالفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة ا لأزارقة.

'এই উম্মাহর জন্য আমরা মুরজিয়াদের ফিতনাকে আজারিক্কাহদের (চরম এক প্রকার খারেজী গোষ্ঠী) ফিতনা থেকে বেশী ভয় করি'।

.

খ) ইমাম আওজায়ী (রঃ) বলেন,

قاا الاوزاعي كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الاهواء شيء

أخوف عندهم على الامة من الارجاء.

'ইয়াহইয়া ও ক্বাতাদা বলেছেন, যে বিদয়াত প্রচলন হয়েছে, এর মধ্যে উম্মাহর জন্য ইরজা এর চেয়ে বেশী অন্য কিছুকে ভয় করি না'।

গ) সাইয়্যেদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেছেন,

قال سعيد بن جبير غير سائله اكرا ذاك له تجالس طلقا

يعني أنه كان يرى رأي المرجئة.

'তাকে প্রশ্ন করবে না, এবং তার কাছে সেটা উল্লেখও করবে না, তালকা (তালকা বিন হাবীব) এর সাথে বসবে না' (কারণ সে মুরজিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতো)

অপর এক বর্ণনায় আছে, সাইয়্যেদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেছেন,

المرجئة يهود القبلة.

'মুরজিয়া হচ্ছে ক্বেবলার (অনুসরণকারী) ইহুদী'।

আল্লাহ মুরজিয়াদের ফিতনা থেকে এই উম্মাহকে হেফাজত করুন। -আমিন

"জিহাদ ঈমানের একটি অংশ ।" -ইমাম বোখারী

# সংশয়: জিহাদ হাসান লি-গাইরিহি

**ইলম ও জিহাদ**

জিহাদ বিমুখতার আরেক খোঁড়া উজর: জিহাদ হাসান লিগাইরিহি।

এরপর হাসান লিগাইরিহির মনগড়া বিভিন্ন ব্যাখ্যা। যেমন,

জিহাদ হাসান লিগাইরিহি আর দাওয়াত হাসান লিআইনিহি। কাজেই জিহাদের চেয়ে দাওয়াত উত্তম, বা দাওয়াতের সুযোগ থাকাবস্থায় জিহাদের প্রয়োজন নেই, কিংবা আরেকটু আগে বেড়ে- দাওয়াত ফরয, জিহাদ হারাম। সাধারণত তাবলিগপন্থীদের মাঝে এ ধরণের ধারণা প্রচলিত।

আবার কেউ কেউ বলেন, হাসান লিগাইরিহি মানে একান্ত জরুরত না হলে জিহাদ করা যাবে না। তবে এ একান্ত জরুরত কখন দেখা দেয় তার কোনো হদ-সীমা নেই। বরং এ শ্রেণীর উদ্দেশ্য জিহাদ সম্পূর্ণ হারাম করে দেয়া।

মোটকথা, 'জিহাদের তুলনায় দাওয়াত উত্তম' বা 'জিহাদের প্রয়োজন নেই' থেকে শুরু করে 'জিহাদ হারাম' পর্যন্ত বিভিন্ন ধারণা হাসান লিগাইরিহির প্রচলিত আছে। এ সংশয়টি সাধারণত কিছু কিছু আলেম ও তালিবুল ইলমের মাঝে দেখা যায়। তাবলিগি হালকায় এর আলোচনা না উঠলে হয়তো সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এ সংশয় ছড়াতো না।

❖ একটি প্রশ্ন

হাসান লিগাইরিহির যে ব্যাখ্যা জিহাদের বেলায় করা হচ্ছে, এ ব্যাখ্যা কি শুধু জিহাদের বেলায়ই প্রযোজ্য না'কি অন্যান্য যেসব বিধানকে হাসান লিগাইরিহি বলা হয়েছে সেগুলোর বেলায়ও প্রযোজ্য? যেমন অযু এবং জানাযার নামায। এ দু'টোকে হাসান লিগাইরিহি বলা হয়েছে। তাহলে কি বলা যাবে, এগুলো না করলেও চলবে, বা না করা ভাল, বা একান্ত জরুরতের হালতেই কেবল করা যাবে, কিংবা করা হারাম? যদি না বলা যায় তাহলে জিহাদের বেলায় ব্যতিক্রম কেন?

❖ হাসান লি আইনিহি-গাইরিহির ভিত্তিতে মূল বিধানে কোনো ব্যবধান আসবে না।

আইনিহি গাইরিহির সাথে ফরয হওয়া না হওয়া বা উত্তম হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ এমন নয় যে, কোনো জিনিস হাসান লিআইনিহি সাব্যস্ত হলে তাকে ফরয বলা হবে আর গাইরিহি হলে তাকে অনুত্তম বা হারাম বলা হবে। আইনিহি গাইরিহি থেকে কোনো বিধান সাব্যস্ত হবে না। বরং বিষয়টি হলো, যেসব বিষয় আগে থেকেই শরীয়ত ফরয ওয়াজিব করে রেখেছে সেগুলো নিয়ে গবেষণা করে বের করা হয়েছে যে,

কোনটি আইনিহি আর কোনটি গাইরিহি। অতএব, কোন বিধান সম্পর্কে আইনিহি গাইরিহির প্রশ্ন তখনই আসবে যখন দলীল প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত হবে যে, শরীয়ত এ বিষয়টি করতে আদেশ দিয়েছে। শরীয়তের আদেশ আসার পর এবং বিধানটি অবশ্যকরণীয় সাব্যস্ত হবার পর আলোচনা আসবে যে, আদেশটা যে দেয়া হয়েছে তা কি আইনিহি হিসেবে না'কি গাইরিহি হিসেবে । এরপর সেটা আইনিহি সাব্যস্ত হোক আর গাইরিহি-ই সাব্যস্ত হোক তার দ্বারা মূল বিধানে কোন তফাৎ আসবে না। মূল বিধান করণীয় করণীয়-ই থেকে যাবে। আইনিহি গাইরহির কারণে তাতে কোনো তফাৎ আসবে না, তবে বিধানের হিকমত ও রহস্য জানা যাবে।

যেমন ধরুন, অযু।
শরীয়ত প্রথমে নামাযের জন্য অযু ফরয করেছে। অযুর আদেশ আসার পর এবং অযু অবশ্যকরণীয় সাব্যস্ত হবার পর উসূলবিদগণ গবেষণা করেছেন যে, অযুর আদেশটা কি আইনিহি হিসেবে না'কি গাইরিহি হিসেবে। দেখা গেল, অযুর আদেশটা গাইরিহি হিসেবে। অর্থাৎ অযুর আদেশটা এসেছে মূলত নামাযের প্রয়োজনে। অন্যথায় অযুর আদেশ দেয়ার দরকার পড়তো না। গাইরিহি হওয়ার অর্থ এটাই। সামনে ইনশাআল্লাহ আমরা এ বিষয়টি একটু স্পষ্ট আলোচনা করবো। অযুর ব্যাপারে যখন বুঝা গেল যে, এটি মূলত হাসান লিগাইরিহি, তখন এর দ্বারা অযুর বিধানে কোনো ব্যবধান আসেনি। অযু ফরয ফরযই রয়ে গেল। তবে অযুর হিকমতটা জানা গেল যে, অযু তথা কয়েকটি অঙ্গ ধৌত ও মাসেহ করা মূলত এমন কোনো কাজ নয় যা ফরয করা দরকার বা এর উপর সওয়াব-গুনাহর হিসাব নিকাশ হওয়া দরকার। তবে নামাযের জন্য যেহেতু পবিত্রতা জরুরী সে হিসেবে অযুর আদেশ দেয়া হয়েছে এবং এর বিনিময়ে সওয়াব নির্ধারণ করা হয়েছে। এর দ্বারা অযুর হিকমত ও রহস্য জানা গেল, অযুর মূল বিধানে কোনো ব্যবধান আসলো না।

অন্য সকল বিধানের বেলায়ও এমনই। জিহাদের বেলায়ও এমন । আগে শরীয়তের আদেশ দ্বারা জিহাদ ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। করলে সওয়াব না করলে গুনাহ ও শাস্তির ফায়সালা হয়ে গেছে। এরপর উসূলবিদগণ গবেষণা করেছেন যে, জিহাদ তথা মারামারি, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ মূলত ফরয করা হয়েছে কুফরের শক্তি চূর্ণ করার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার দ্বীন বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কুফর যদি না থাকতো জিহাদের প্রয়োজন পড়তো না। এ হিসেবে জিহাদ হাসান লিগাইরিহি। তবে আইনিহি হোক গাইরিহি হোক তা ফরয। আইনিহি গাইরিহির গবেষণার দ্বারা জিহাদ ফরয হওয়ার হিকমতটা জানা গেল, কিন্তু জিহাদ ফরয ফরযই রয়ে গেল। গাইরিহি হওয়ার দ্বারা ফরযে কোনো ব্যবধান আসেনি।

উপরোক্ত কথাগুলো বুঝার পর বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ।

উসূলবিদগণ আইনিহি গাইরিহির আলোচনাটা এনেছেন 'আমর' (الأمر) তথা আদেশের আলোচনায়।

প্রথমে আলোচনা করেছেন যে, 'আমর' উজূব (الوجوب)-এর জন্য আসে। অর্থাৎ শরীয়ত যে বিষয়টি করার আদেশ দিয়েছে সেটি করা আবশ্যক। এ আদিষ্ট বিষয়টিকে 'মা'মূর বিহি' (المأمور به) বলে। দলীল প্রমাণের আলোকে কোনো কোনো মামূর বিহি ফরয (যেমন নামায, জিহাদ) আর কোনো কোনোটা ওয়াজিব (যেমন, সাদাকায়ে ফিতর)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করেছেন যে, মামূর বিহি অবশ্যই 'হাসান' (حسن) তথা ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ হয়ে থাকে। অর্থাৎ শরীয়ত যে কাজটি করার আদেশ দিয়েছে সেটি অবশ্যই ভাল, প্রশংসনীয় এবং সওয়াবের কাজ। কেননা, আল্লাহ তাআলা কোনো মন্দ কাজের আদেশ দেন না। যেমনটা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

"আল্লাহ তাআলা মন্দ কাজের আদেশ দেন না।" –আ'রাফ ২৮

তৃতীয় পর্যায়ে আইনিহি ও গাইরিহির আলোচনা এনেছেন। অর্থাৎ মামূর বিহিটি যে ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ তা কেন? এ আলোচনাটি মূলত মামূর বিহিটি হাসান কেন হল তার হিকমত ও রহস্য নিয়ে আলোচনা।

যেমন ধরুন নামায। আল্লাহ তাআলা এ জাতীয় আয়াতের মাধ্যমে নামাযের আদেশ দিয়েছেন,

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

"নামায কায়েম কর।' –আনআম ৭২

প্রথমে আলোচনা হবে, উসূলবিদদের তারতিব অনুযায়ী, নামায হলো মামূর বিহি। আল্লাহ তাআলা এর আদেশ দিয়েছেন। অতএব, নামায ফরয।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা আসবে, নামায যেহেতু মামূর বিহি অতএব, তা অবশ্যই হাসান তথা ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের

কাজ।

তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা আসবে, নামায যে হাসান তা কেন? অর্থাৎ নামায কেন ভাল, প্রসংশনীয় ও সওয়াবের কাজ। এটি মূলত নামায ভাল কেন তার হিকমত নিয়ে আলোচনা।

জিহাদের বেলায়ও এমনই। উসূলে ফিকহের তারতিব অনুযায়ী প্রথমে আলোচনা আসবে, আল্লাহ তাআলা জিহাদের আদেশ দিয়েছেন বিভিন্ন আয়াতে। অতএব, জিহাদ একটি মামূর বিহি। কাজেই তা ফরয।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা আসবে, যেহেতু জিহাদ মামূর বিহি কাজেই তা অবশ্যই হাসান তথা ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ।

তৃতীয় পর্যায়ে আলোচনা আসবে, জিহাদ যে হাসান তথা ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ তার কারণ ও হিকমত কি?

তাহলে লিআইনিহি বা গাইরিহির আলোচনার আগে আরো দু'টি আলোচনা আছে, যে দু'টি আলোচনার দ্বারা দু'টি হুকুম সাব্যস্ত হয়ে গেছে,

এক. জিহাদ ফরয।
দুই. জিহাদ হাসান তথা ভাল, প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ।

ইসলামের সকল বিধানের বেলায়ই এ তিন স্তরের আলোচনা প্রযোজ্য। তবে তৃতীয় আলোচনাটি আসলে কোন জরুরী আলোচনা নয়। নামায কেন ভাল, যাকাত কেন ভাল, হজ্ব কেন ভাল, জিহাদ কেন ভাল- এগুলো না জানলেও কোনো সমস্যা নেই। এ হিকমত জানা আবশ্যক নয়। অনেকাংশে এটি একটি আকলি বহস। এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা নামায, রোযা, হজ, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি বিধান ফরয করেছেন । কেন ফরয, কি কারণে ফরয, এর হিকমত কি- এসব আকলি বহসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহর গোলাম। আল্লাহ আমাকে করতে আদেশ দিয়েছেন, এখন আমাকে করতে হবে। ব্যস্। এতটুকুই যথেষ্ট। এত বেশি কেনো কোনো-তে যাওয়ার দরকার নেই। এ কারণে দেখা গেছে, এ আইনিহি গাইরিহির মারপ্যাঁচে উসূলবিদদের একটা বিশেষ শ্রেণীই কেবল গিয়েছেন, বাকিরা এসব আলোচনা এড়িয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা সকলের প্রতি রহম করুন।

বুঝার স্বার্থে কয়েকজন উসূলবিদের উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

ইমাম নাসাফি রহ. (৭১০হি.) 'আলমানার' এ বলেন (পৃ. ৫),

ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم ... وهو أما أن يكون لعينه ...
كالتصديق والصلاة والزكاة، أو لغيره ... كالوضوء والجهاد. اهـ

"অবশ্যই অবশ্যই মা'মূর বিহি হাসান হতে হবে। কেননা, আদেশদাতা হচ্ছেন হাকিম তথা সীমাহীন হিকমতের অধিকারী সত্তা (যিনি মন্দের আদেশ দিতে পারেন না)। তবে তা লিআইনিহি হতে পারে। যেমন (যেসব বিষয়ে ঈমান জরুরী সেগুলোতে) আন্তরিক বিশ্বাস এবং নামায ও যাকাত। কিংবা লিগাইরিহি হতে পারে। যেমন অযু ও জিহাদ।"

এখানে ঈমান, নামায, যাকাত, অযু ও জিহাদ এ পাঁচটি মামূর বিহি তথা ফরয। এগুলোর ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, এগুলো অবশ্যই ভাল, প্রশসংনীয় ও সওয়াবের কাজ। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ভাল হওয়ার দিক থেকে এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: লিআইনিহি, লিগাইরিহি।

ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

اعلم أن مطلق مقتضى الأمر كون المأمور به حسنا شرعا ... وبيان كونه ثابتا شرعا أن الله
تعالى لم يأمر بالفحشاء كما نص عليه في محكم تنزيله والأمر طلب إيجاد المأمور به بأبلغ
الجهات ولهذا كان مطلقه موجبا شرعا والقبيح واجب الإعدام شرعا فما هو واجب الإيجاد
شرعا تعرف صفة الحسن فيه شرعا . ثم هو في صفة الحسن نوعان حسن لمعنى في نفسه
وحسن لمعنى في غيره .اهـ

"ভাল করে জেনে রাখো, কোনো বিষয়ে আদেশ দেয়ার দাবি হচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিতে মা'মূর বিহি তথা আদিষ্ট বিষয়টি হাসান। কারণ, আল্লাহ তাআলা কোনো মন্দ কাজের আদেশ দেন না, যেমনটা আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট জানিয়েছেন। ... তবে এক্ষেত্রে তা দু'ভাগে বিভক্ত: হাসান লিআইনিহি ও হাসান লিগাইরিহি।" –উসূলে সারাখসী ১/৬০

এরপর হাসান লিআইনিহির উদাহরণ দেন ঈমান, নামায, রোযা ও যাকাত দিয়ে। হাসান লিআইনিহি হাসান লিগাইরিহি উভয়ে আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। সে আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না।

তারপর হাসান লিগাইরিহির উদাহরণ দেন জুমআর নামাযে যাওয়ার জন্য চলা, অযু, জানাযার নামায, জিহাদ ও হুদুদ দিয়ে।

কিতাল ও হুদুদ প্রসঙ্গে বলেন,

القتال مع المشركين حسن لمعنى في غيره وهو كفر الكافر أو قصده إلى محاربة المسلمين وذلك مضاف إلى اختياره وكذلك القتال مع أهل البغي حسن لدفع فتنتهم ومحاربتهم عن أهل العدل وكذا إقامة الحدود حسن لمعنى الزجر عن المعاصي وتلك المعاصي تضاف إلى كسب واختيار ممن تقام عليه ولكن لا يتم إلا بحصول ما لأجله كان حسنا . وحكم هذا النوع أنه يسقط بعد الوجوب بالأداء وبانعدام المعنى الذي لأجله كان يجب حتى إذا تحقق الانزجار عن ارتكاب المعاصي أو تصور إسلام الخلق عن آخرهم لا تبقى فرضيته إلا أنه خلاف للخبر لأنه لا يتحقق انعدام هذا المعنى في الظاهر. اهـ

“মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিতাল হাসান লিগাইরিহি তথা ভিন্ন একটি বিষয়ের কারণে তা হাসান। আর তা হল কাফেরের কুফরি কিংবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের প্রবণতা। ... তদ্রূপ বাগিদের বিরুদ্ধে কিতাল করা এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান যে, এর দ্বারা আহলে আদলের উপর থেকে বাগিদের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত ফিতনা ও মারামারি প্রতিহত করা যাচ্ছে।

তদ্রূপ হুদুদ কায়েম করা এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাসান যে, এর দ্বারা গুনাহ থেকে বিরত রাখা যাচ্ছে। ...

এ ধরণের মা’মূর বিহির বিধান হল (দুই জিনিসের কোনো একটার দ্বারা এর যিম্মাদারি আদায় হবে),

(এক.) ফরয হওয়ার পর সম্পাদন করে নিলে এর যিম্মাদারি আদায় হয়ে যাবে।

(দুই.) যে কারণে তা ফরয হয়েছিল সে কারণটি না থাকলেও এর দায়িত্ব রহিত হয়ে যাবে। অতএব, যদি কেউই গুনাহে লিপ্ত না হয় কিংবা জগতবাসী সকলেই যদি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে (হুদুদ ও জিহাদ)-এর ফরয দায়িত্ব আর থাকবে না। তবে হাদিসের ভাষ্যমতে এমনটি হবে না। কেননা, যে কারণে তা ফরয সে কারণটি স্বাভাবিক দূরীভূত হয়ে যাবে না।”

–উসূলে সারাখসী ১/৬২

অর্থাৎ দারুল ইসলামের অধিবাসীরা কখনও কখনও হলেও হদ-জাতীয় কোনো না কোনো অপরাধ করবেই স্বাভাবিক। যার ফলে তাদের উপর হদ কায়েম করতে হবে। আর কাফেররাও সকলেই যে মুসলমান বা যিম্মি হয়ে যাবে তা নয়। ফলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেই যেতে হবে কিয়ামত অবধি। হাদিসে এমনটাই পরিষ্কার এসেছে।

আব্দুল আজিজ বুখারি রহ. (৭৩০হি.) বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেন,

لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة» وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال» . اهـ

“কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইরশাদ করেন, ‘এ দ্বীন সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (কারণ,) কেয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের একটা দল বিজয়ী বেশে (দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে) কিতাল করতে থাকবে’।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘আমার উম্মতের একটা দল কেয়ামত পর্যন্ত কিতাল করতে থাকবে। তারা থাকবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের বিরোধীদের উপর হবে প্রতাপশালী। (এ ধারাবাহিকতা চলতে চলতে) তাদের সর্বশেষ দলটি মাসিহে দাজ্জালের সাথে কিতাল করবে’।” –কাশফুল আসরার ১/১৯০

প্রথম হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. রিওয়ায়াত করেছেন (সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ইমারা, হাদিস নং ৫০৬২)।

দ্বিতীয় হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. রিওয়ায়াত করেছেন (সুনানে আবু দাউদ, বাবু: ফি দাওয়ামিল জিহাদ, হাদিস নং ২৪৮৬)।

### সারকথা

আইনিহি-গাইরিহির আলোচনা দ্বারা ফরয হয়ে থাকা বিধানগুলোর হিকমত জানা যাবে, মূল ফরযে কোন ভিন্নতা আসবে না। নামায লিআইনিহি হয়ে যেমন ফরয; জুমআর নামাযের জন্য গমন, জানাযার নামায, অযু ও জিহাদ গাইরিহি হয়ে তেমনই ফরয। ফরযে কোনো তারতম্য নেই। অধিকন্তু এ আলোচনা আকলি তথা আকল প্রসূত। এর পিছে না পড়াই ভাল।

পাশাপাশি এও জানা গেল, কুফরের যে শক্তি চূর্ণ করার জন্য জিহাদ ফরয করা হয়েছে তা কেয়ামত অবধি বহাল থাকবে বিধায় জিহাদের ফরযও কেয়ামত অবধি বহাল থাকবে।

ওয়াল্লাহু আ’লাম

ISLAM
"THE DISCOURSE ABOUT ALLAH WOULD NOT CONCLUDE EVEN IF ALL THE TREES ON THIS EARTH WERE MADE INTO PENS AND THE ENTIRE SEA SERVED AS INK"
- HOLY QURAN 31:27

## হুসাইন ইবনু মানসুর হাল্লাজ'কে নিয়ে

# সাদামাটা কিছু কথা।

কিছু সাদামাটা কথা বলি। কার পছন্দ হলো আর কার আঁতে ঘা লাগল, বরাবরের মতোই তা দেখার বিষয় নয়।

আমাদেরকে শরিয়াহ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শরিয়াহর আলোকে জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান করার আদেশ করা হয়েছে। আলিমগণও শরিয়াহর আলোকেই ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। ফাতওয়া এবং বিচার পরিচালনা করার জন্য সবার থেকে আড়াল করা গোপন কোনো বিধান, সংবিধান, আইন ও মাপকাঠি নেই। সুফিদের পরিভাষার তরিকত, মারেফত, হাকিকত দিয়ে তাসাওউফ চললেও এগুলোর দ্বারা ফাতওয়া ও বিচার চলে না।

হুসাইন ইবনু মানসুর হাল্লাজকে তার হুলুলি আকিদার কারণে মুরতাদ ফাতওয়া দেওয়া হয়েছিল। এই ফাতওয়া সালাফের মহান ইমামগণই দিয়েছিলেন। এরপর সেই ফাতওয়ার আলোকে তাকে হত্যাদণ্ডও দেওয়া হয়েছিল। এবং এই ফায়সালা তারা শরিয়াহর আলোকেই দিয়েছিলেন।

এবার যে বিষয়টার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি, সালাফগণ কি তাকফিরের মূলনীতি জানতেন না? নিশ্চয়ই জানতেন। আমাদের চেয়ে অনেক ভালো জানতেন। আমরা তো জানিই না। তাকফিরের মূলনীতি নিয়ে আমাদের মাদরাসাগুলোতে বা ফাতওয়া বিভাগগুলোতে তো কোনো পড়াশোনাই নেই। তো তাকফিরের একটা মূলনীতি হলো, যে বিষয়কে কেন্দ্র করে তাকফিরের ফাতওয়া প্রদান করা হবে, সে বিষয়টা শতভাগ সুনিশ্চিত হতে হবে। তাতে ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ থাকতে পারবে না। যদি কোনো বিষয় এমন হয় যে, তাতে ৯৯% কুফরের সম্ভাবনা আছে আর মাত্র এক ভাগ ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ আছে তাহলে এর ভিত্তিতে কাউকে তাকফির করা যায় না।

হুসাইন হাল্লাজ সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানছি, এগুলো হলো বর্ণনানির্ভর। অপরদিকে তারা তার ব্যাপারে যে ফাতওয়া প্রদান করেছিলেন, তার ভিত্তি বর্ণনা বা শ্রুতিনির্ভর ছিল না; বরং হুসাইনের জীবনাচার তাদের চোখের সামনেই ছিল। তারা স্বচক্ষে তার অবস্থা দেখেছেন, সরাসরি তার হালতের তাহকিক করেছেন। এখন যদি বলা হয়, তারা তাকফিরের মূলনীতি জানতেন, তাহলে কীভাবে ভাবা যায়, তারা জেনেবুঝে তার ব্যাপারে তাকফিরের মূলনীতি লঙ্ঘন করেছেন এবং পরবর্তী যুগের যুগশ্রেষ্ঠ অনেক ইমামও তাদের সেই ফাতওয়ার সমর্থন করেছেন। আর যদি বলা হয়, তারা তাকফিরের মূলনীতি জানতেন না, তাহলে এটা তো অযৌক্তিক ও অবাস্তব প্রলাপ এবং তাদের ব্যাপারে অবান্তর ধারণা ছাড়া আর কিছু হবে না।

এ গেল একদিক। এবার আরেকদিক থেকে বিষয়টা দেখি। শরিয়াহর দণ্ডবিধি তিন ধরনের : (ক) কিসাস, (খ) হুদুদ এবং (গ) তাজির। হুসাইন হাল্লাজের ওপর কিসাস বা তাজির প্রয়োগ করা হয়নি। বরং তার ওপর রিদ্দাহর হদ প্রয়োগ করা হয়েছিল। হুদুদের ব্যাপারে স্বীকৃত মূলনীতি হলো, যেকোনো সংশয়ের দ্বারা হদ রহিত হয়ে যায়। সামান্য সংশয় থাকলেও হদের পরিবর্তে তাজির প্রয়োগ করা হয়। কারণ, একজন মানুষকে ভুলে হত্যা করার চাইতে তাকে ভুলে বাঁচিয়ে রাখা ঢের উত্তম। তো সেই যুগে তার ওপর হদ প্রয়োগ করা হয়েছিল, তৎকালীন সালাফ ইমামগণ তা মেনেও নিয়েছিলেন, বরং তাদের ফাতওয়ায়ই তা কার্যকর হয়েছিল; এর সরল অর্থ তো এটাই যে, তাদের দৃষ্টিতে তার ওপর হদ প্রয়োগ করা যথাযথ ছিল। শরিয়াহর দৃষ্টিতে তা ভুল ছিল না। অন্যথায় এটা কীভাবে ভাবা যায় যে, তারা সকলে মিলে অসৎকাজের প্রতিবাদ করা ও তা থেকে নিষেধ করার সুন্নাহ পরিত্যাগ করেছেন বা তা বিস্মৃত হয়েছেন।

এবার আসি আরেক দিকে। ধরে নিলাম, হুসাইন হাল্লাজ আল্লাহর বড় ওলি ছিল। তার ওপর তাকফিরের যে ফাতওয়া প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা উসুলের স্পষ্ট লঙ্ঘন ছিল। এমনকি তার ওপর প্রয়োগকৃত হদও সম্পূর্ণ ভুল, ইনসাফ-বহির্ভূত আচরণ ও জুলুম ছিল। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার গোটা তাসাওউফপন্থীরা এ কথা মানতে বাধ্য যে, সে একজন মাজযুব ছিল। মাজযুবকে যদি

স্বীকৃত উসুল অনুসারে মাজুর হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে মাজুর তো কারও জন্য আদর্শ হয় না। তাহলে অযথাই কেন এই হাল্লাজকে আদর্শপুরুষ হিসেবে প্রচার করা হয়? দুনিয়ায় হাল্লাজকে ভাইরাল করেছে তো তাকফিরিরা নয়; বরং একদল সুফিবাদী। এত এত কামেল শায়খ থাকতে তারা কেন এক মাজযুবকে প্রমোট করেছে? কেন মুরিদানকে মাজযুবের মতো হতে উৎসাহিত করেছে। অথচ মাজযুব হওয়া ইখতিয়ারি (ঐচ্ছিক) বিষয় নয়; এটা সম্পূর্ণ গাইরে ইখতিয়ারি বিষয়। গাইরে ইখতিয়ারি জিনিসকে তো কখনো প্রমোট করা যায় না। তা তো আল্লাহর ইচ্ছা; আল্লাহ যাকে চান, দান করেন। উপরন্তু তাসাওউফের দৃষ্টিতেই মাজযুবের হালত হওয়া কোনো কামাল নয়; বরং এটা দুর্বলতা। যাদের ভেতর মজবুত, তারা এর শিকার হন না। এ জন্য সাহাবিরা মাজযুব ছিলেন না। মাজযুব একে তো মাজুর, অপরদিকে সে হলো দুর্বল। সুতরাং এর ওপর এত ফোকাস করার তো কোনো যুক্তি হয় না

জিকির করতে করতে কেউ কেউ ওয়াজদের শিকার হতে পারেন। এটা অসম্ভব কিছু নয়; তবে অস্বাভাবিক তো বটে। কুরআনে কোথাও ওয়াজদ সৃষ্টি করার নির্দেশ বা উৎসাহ দেওয়া হয়নি। কেউ যদি কুরআনের কোনো আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করে, তাহলে সে একজন মূর্খ বা অপব্যাখ্যাকারী বৈ কিছু নয়। রাসুলুল্লাহ সা. ও তার সাহাবিরা ওয়াজদের রোগী ছিলেন না। ওয়াজদ গাইরে ইখতিয়ারি। ওয়াজদ ওজর। ওয়াজদ দুর্বলতা। কিন্তু আজকাল কিছু মানুষ মেহনত করে, নিজের ওপর চাপ প্রয়োগ করে ওয়াজদ সৃষ্টি করতে চায়। ওয়াজদের রোগীকে বড় আল্লাহওয়ালা ও 'মাওলার প্রেমের আশেক' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এ সবই অজ্ঞতার প্রভাব।

আজকাল যেসব বক্তা ওয়াজদে আক্রান্ত রোগী বা মাজযুবদেরকে আল্লাহর বড় 'আশেক' হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়, যারা জিকিরের প্রভাবে পাগলামি শুরু করাকে কামাল হিসেবে বিবেচনা করে, তাদের ফাতওয়ায় তারা নিজেরাই প্রথমে আটকে যাবে। এটা যদি কামালই হয়, তাহলে বক্তার নিজের এই অবস্থা সৃষ্টি হয় না কেন? নাকি সে শুধুই টাকার জন্য ওয়াজ করে আর মানুষের ইমোশন নিয়ে খেলা করে, তাই তার নিজের এই অবস্থা হয় না?

উপরন্তু এটাকে যদি ওয়াজদ বলিও, তাহলে এটা যতটা না জিকিরের প্রভাব; তারচে বেশি হলো হৃদয়স্পর্শী সুর ও নৈরাশ্যের প্রভাব। সুরের প্রভাব অনস্বীকার্য। মাইকেল জ্যাকসনের গানের সুর ও মিউজিক শুনেও শ্রোতাদের 'ওয়াজদ' সৃষ্টি হতে পারে। আত্মভোলা হয়ে তারা উন্মাদনা শুরু করতে পারে। এবং এটা হয়ও। যে সকল বক্তার ওয়াজে শ্রোতাদের ওয়াজদ সৃষ্টি হয়, তাদেরকে যদি সুর ছাড়া মাওলানা ওলিপুরি হজরতের স্টাইলে বয়ান করতে বলা হয় এবং প্রচণ্ড নৈরাশ্যমূলক কথা বলা যদি সাময়িককালের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে কয়জনকে বাঁশের আগায় লাফাতে বা মাঠে বসে পাগলামি করতে দেখা যায়। তাদের সুরের প্রভাব এত বেশি যে, আমি নিজ কানে সেই সুরে কোনো কোনো বিদআতি বক্তার আলোচনা শুনে দেখেছি, তা শ্রোতাদের ওপর একই প্রভাব সৃষ্টি করে। আর তারা নৈরাশ্য সৃষ্টি করে শ্রোতাদের যে ওয়াজদ সৃষ্টি করে, হাদিসের নির্দেশনা অনুসারে তারা জান্নাতের প্রত্যাশা জাগিয়ে সেই অবস্থা কখনোই সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না।

আবেগের প্রভাব সাময়িক। বিবেকের প্রভাব স্থায়ী। আবেগনির্ভর ইসলাম পালন টেকসই হয় না। বিবেকনির্ভর ইসলাম পালন টেকসই হয়। হ্যাঁ, আমরা দার্শনিকদের মতো একেবারে আবেগমুক্ত বিবেকের কথা বলছি না; কারণ, বিবেকআশ্রিত আবেগ দূষণীয় নয়। তবে আবেগ সর্বদা বিবেকের অনুগামী থাকবে। আবেগের আতিশয্য বিবেকের সীমানা লঙ্ঘন করবে না। কিছু মানুষ জিকির-আজকার করে আবেগের সাগরে এত বেশি হাবুডুবু খেতে শুরু করে, তারা আর বিবেককে মোটেও কাজে লাগায় না। আল্লাহ প্রদত্ত এই যোগ্যতা অকার্যকর করে ফেলে। যার কারণে তাদেরকে ইমোশনাল এটাক দিয়ে পাগলামিতে লাগিয়ে দেওয়া সহজ হলেও তাদের বিবেককে আকর্ষণ করে তাদেরকে শরিয়াহর শাশ্বত অনেক নির্দেশের দিকে তাড়িত করা যায় না। তারা এতটাই অন্ধ হয়ে যায় যে, শত বোঝানোর পরও ইসলাম কায়েমের স্বপ্ন নিয়ে আজীবন আলেয়ার আলো ও ধু ধু মরীচিকার পেছনেই ছুটতে থাকে। দিবাস্বপ্নকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে। তারা মাওলার প্রেমে আশেক হয় কথিত বড় জিহাদে জীবন উৎসর্গ করতে পারলেও প্রকৃত জিহাদের ময়দানে তাদের অংশগ্রহণ কখনোই চোখে পরে না। অথচ তারা জানে না, বড় আব্বা যেমন আব্বা নয়, কথিত বড় জিহাদও আদতে কোনো জিহাদই নয়।

যে সকল বক্তা কথায় কথায় বিপরীত পক্ষকে গালি দেয়, যে সকল গেঁয়ো, স্বল্পশিক্ষিত, কর্কশভাষী, আত্মমুগ্ধ ও অহংকারী বক্তা মাইক পেয়ে তাল হারিয়ে 'বেঈমান' 'মুনাফিক' 'বেয়াদব' 'বদমাইশ' 'মূর্খ' 'আহাম্মক' শব্দ ছাড়া মুসলমান ভাইকে উপহার দেওয়ার মতো আর কিছু পায় না, তারা তাসাওউফজীবী হতে পারে, তারা পির-মুরিদির সাইনবোর্ড লাগিয়ে ধর্মব্যবসা করতে পারে, তারা নবির সুন্নাহর স্বঘোষিত ঠিকাদার হতে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে নববি আদর্শের ছিটেফোঁটাও নেই। তাদের মানহাজ পরিশুদ্ধ নয়। আর যে ফরজ ছেড়ে নফল নিয়ে পড়ে থাকে, এমনিও তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো, যে গাছের শিকড় কেটে গাছের আগায় পানি ঢালতে থাকে।

'নিশ্চয়ই চোখ অন্ধ হয় না; বরং অন্ধ হয় বক্ষঃস্থিত অন্তর।' আল্লাহ সবাইকে হক গ্রহণ করার যোগ্যতা দেন না। যুগ যুগ ধরে এত আলিমের স্পষ্ট বিবৃতি শুনেও যারা নিজেদের সংগঠনের বাতিল নাম পরিবর্তনের উদারতাটুকুই দেখাতে পারে না, মানুষ কীভাবে যে তাদেরকে এ যুগের ত্রাতা ভাবে, তা আমার কিছুতেই বুঝে আসে না।

(সংগ্রহিত।)
তাযকিয়াতুন নাফস

# সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী

abu dujanah

85 : আল্লাহ তাকে ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দেন

من تحبب الى العباد بالمعاصي بغضه الله اليهم

যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানির মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রিয়পাত্র হওয়ার চেষ্টা করে আল্লাহ তাকে তাদের কাছে ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দেন।-ইমাম ইবনুল হাদ্দাদ রহ.

--------------------------------

86 : সে কখনো তার এ মূল্যবান পুঁজি নষ্ট করে না

من علم أن العمر بضاعة يسيرة،

يسافر بها إلى البقاء الدائم في الجنة، لم يضيعه

যার এ কথা জানা আছে যে, তার জীবনটি হল তার হাতে থাকা সামান্য পুঁজি মাত্র, যা দিয়ে তাকে অন্ততকালের জান্নাতের দিকে সফর করতে হবে সে কখনো তার এ (মূল্যবান) পুঁজি নষ্ট করে না।-ইমাম ইবনুল জাওযী রহ.

--------------------------------

87 : আমাদের অন্তরসমূহকে সত্যবিমুখ করে দিও না

زمن التقلبات والانتكاسات ينبغي اللجوء إلى الله، كان أبو بكر الصديق زمن المرتدين

يقنت لنفسه في صلاته فيتلو (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا).

ফেতনা-ফাসাদ ও সত্যবিমুখতার এ যুগে আল্লাহর দিকে বেশি বেশি রুজু হওয়া (অর্থাৎ আল্লাহমুখী হওয়া, তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া, কান্নাকাটি করা) জরুরি। হযরত আবু বকর রাযি.এর যুগে যখন ব্যাপকভাবে মানুষ দ্বীন ত্যাগ করতে শুরু করে তখন তিনি নামাযের মধ্যে এ দোয়া পড়তে শুরু করেন,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে পথ দেখানোর পর আমাদের অন্তরসমূহকে বক্র (সত্যবিমুখ) করে দিও না। আর আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান কর। নিঃসন্দেহে তুমিই মহান দাতা। -সূরা আলে ইমরান : 8

88 : কে আছে, যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?

من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم، حين يقول:

رب "اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ"

ইবরাহীম আ.-এর মতো ব্যক্তিও যখন আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন, পরওয়ারদেগার, আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে প্রতিমা-পূজা থেকে দূরে রাখুন, তখন কে আছে, যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? -ইমাম ইবরাহীম আততাইমী রাহ.(তফসীরে তবারী ১/৪৬০)

--------------------------------

89 : ওই ব্যক্তির প্রতি আমার ঈর্ষা হয়

إني لأغبط رجلا معه دينه وما معه من الدنيا شيء وهو راض.

ওই ব্যক্তির প্রতি আমার ঈর্ষা হয়, যার কাছে দীনদারি আছে (ষোল আনা)। কিন্তু দুনিয়ার তেমন কিছুই তার কাছে নেই তবুও সে খুশি। বিখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ বিন ওয়াসে' রহ.

--------------------------------

90 : সে দ্রুত আখেরাতে যেতে চায়

من أكثر من عمارة الدنيا أحب البقاء فيها،

ومن أكثر من عمارة الآخرة أحب التعجيل إليها.

যে ব্যক্তি তার দুনিয়াকে আবাদ করে, সুন্দর বানায় সে সেখানেই থাকতে চায়। আর যে ব্যক্তি তার আখেরাকে আবাদ করে, সুন্দর বানায় সে সেখানেই দ্রুত যেতে চাই।

-শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী হাফি.

# VOI
## VOICE OF ISLAM

শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ)
ভারতের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তিঃ হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন
VOI
VOICE OF ISLAM

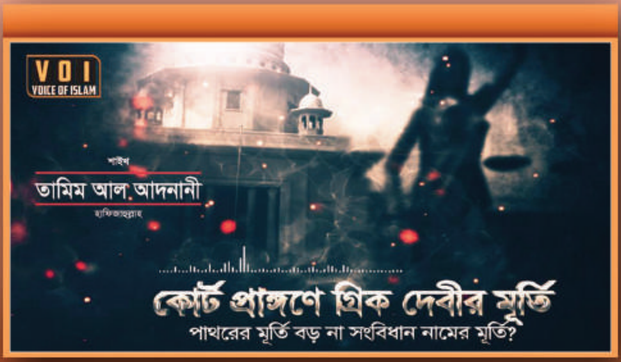
VOI
VOICE OF ISLAM
শাইখ
তামিম আল আদনানী
হাফিজাহুল্লাহ
কোর্ট প্রাঙ্গণে গ্রিক দেবীর মূর্তি
পাথরের মূর্তি বড় না সংবিধান নামের মূর্তি?

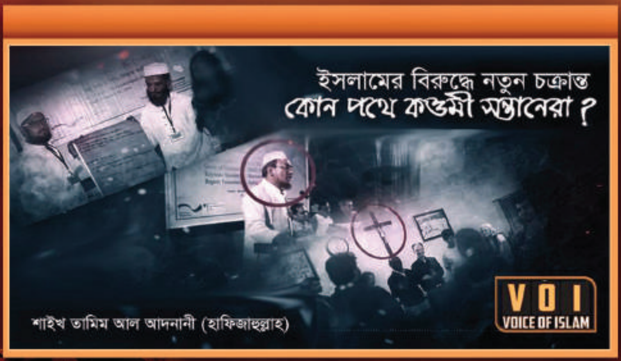
ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন চক্রান্ত
কোন পথে কওমী সন্তানেরা ?
VOI
VOICE OF ISLAM
শাইখ তামিম আল আদনানী (হাফিজাহুল্লাহ)

প্রথমআলো-ডেইলি স্টার আপনাকে শেখাবে ক্ষমতাসীন আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে দেখতে। বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অফ অ্যামেরিকা আপনাকে শেখাবে পশ্চিমা কাফিরদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে বিচার করতে। আর ভয়েস অফ ইসলাম আপনাকে জানাবে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান। Voice of Islam [VOI] - এর সাথেই থাকুন, ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখুন।

আর ভিজিট করুন-
https://dawahilallah.com/
https://alfirdaws.org/
http://gazwah.net/